মিসির আলি আপনি কোথায়

হুমায়ূন আহমেদ

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

১. মিসির আলি কুয়াশা দেখছেন. 2
২. মিসির আলি বটগাছের গুড়িতে. 23
৩. মিসির আলি বারান্দায় বসে আছেন 46
৪. তরিকুল ইসলামের বিরাট সমস্যা 70
৫. ছাত্রের ডায়েরি 91
৬. গরম চাদর গায়ে দিয়ে 111
৭. ঘুম ভাঙ্গে ফজরের ওয়াক্তে. 118
৮. বঙ্গোপসাগরে ডিপ্রেসন 127

১. মিসির আলি কুয়াশা দেখছেন

মিসির আলি অবাক হয়ে কুয়াশা দেখছেন।

কুয়াশা দেখে অবাক বা বিস্মিত হওয়া যায় না। তিনি হচ্ছেন। কারণ কুয়াশা এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই। সে জায়গা বদল করছে। তার সামনে মাঝারি সাইজের আমগাছ। কুয়াশায় গাছ ঢাকা। ডালপালা পাতা কিছু দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ কুয়াশা সরে গেল। আমগাছ দেখা গেল। সেই কুয়াশাই ভর করল পাশের একটা গাছকে, যে গাছ তিনি চেনেন না।

বাতাস কুয়াশা সরিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিচ্ছে এই যুক্তি মেনে নেয়া যাচ্ছে না। বাতাস বইলে তিনি টের পেতেন শীতের বাতাস শরীরে কাঁপন ধরায়।

এই কুয়াশার ইংরেজি কি Fog নাকি Mist? শহরের কুয়াশা এবং গ্রামের কুয়াশা কি আলাদা? শহরের ধূলি ময়লার গায়ে চেপে যে কুয়াশা নামে তাকে কি বলে Smog?

মিসির আলি বেতের মোড়ায় চাদর গায়ে দিয়ে বসে আছেন। তাঁর পায়ে উলের মোজা। শিশিরে মোজা ভিজে যাচ্ছে। হাতে Louis Untermeyer নামের এক ভদ্রলোকের বই নাম Poems. বইয়ের পাতাও শিশিরে ভিজে উঠছে। তিনি কইলাটি নামের এক গণ্ডগ্রামে গত দুদিন ধরে বাস করছেন। এখন বসে আছেন দোতলা এক হলুদ রঙের পাকা বাড়ির সামনে। বাড়ি কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সূর্য উঠলে প্রথমেই তাঁর গায়ে রোদ পড়বে। সূর্য উঠছে না।

তাঁর চা খেতে ইচ্ছে করছে, তাঁকে চা দেয়া হচ্ছে না। তাঁর জন্য খেজুরের রস আনতে লোক গিয়েছে। কইলাটি হাইস্কুলের হেডমাস্টার তরিকুল ইসলাম এমএ বিটি বলেছেন- খেজুরের রস এক গ্লাস খাবার পর চা দেয়া হবে। তার আগে না। খেজুরের রস নাকি খালি পেটে খেতে হয়।

তরিকুল ইসলাম এই মুহূর্তে মিসির আলির আশপাশে নেই। বাড়িতে ভাপাপিঠা রান্না হচ্ছে। তিনি পিঠার খবরদারি করছেন। পিঠা জোড়া লাগছে না। ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে রাগারগি করছেন। গতকাল দুধপিঠা হয়েছিল। দুধ কী কারণে ছানা ছানা হয়ে গেল, মেহমানের সামনে বেইজ্জাতি ব্যাপার। ঢাকার মেহমানকে একদিনও ভালো মতো পিঠা খাওয়ানো যায় নি, এরচে দুঃখের ব্যাপার কী হতে পারে?

গ্রামের মানুষদের মধ্যে সবচে বেশি কথা বলে নাপিতরা। তারপরেই স্কুল শিক্ষকরা। তরিকুল ইসলাম কথা বলায় শিক্ষকদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন। তিনি সারাক্ষণই কথা বলেন। কেউ তার কথা শুনিছে কি শুনছে না, তা নিয়ে মাথা ঘামান না। এখন তিনি কথা বলে যাচ্ছেন স্ত্রীর সঙ্গে। তার স্ত্রী সালেহা মাথায় ঘোমটা দিয়ে পিঠা বানাচ্ছেন। তিনি চুলার আগুনের পাশে হাত মেলে কথার তুফান মেইল চালাচ্ছেন–

সালেহা! তুমি বাংলাদেশের গ্রামের একজন সিনিয়ার মহিলা। তুমি পিঠা বানাতে পার না এটা কত বড় দুঃখের কথা তা কি জান? এটা হল ক্লাস থ্রির পরীক্ষায় ফেল করার মতো। শহরের একজন বিশিষ্ট মেহমান তাকে আমি পিঠা খাওয়াতে পারব না? কী আপশোস! আরেক হারামজাদাকে খেজুরের রস আনতে পাঠালাম তার খোজ নাই। সে মনে হয় খেজুরগাছে চড়ে বসে আছে। কাঁটার ভয়ে নামতে পাবছে না। এদের সকল বিকাল থাপড়ানো দরকার। বদমাইশের ঝাড়। কামের মধ্যে নাই, আকামে আছে।”

মিসির আলি হতাশ চোখে তাঁর হাতের জাম্বো সাইজের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে আছেন। এত বড় গ্লাস যে এখনো বাংলাদেশে আছে তা তিনি জানতেন না। পুরো এক জগা পানি এই গ্লাসে ধরবে তারপরেও গ্লাস ভরবে না, এ বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই।

তরিকুল ইসলাম বললেন, এক চুমুকে খান। অতি সুস্বাদু। অমৃত সম।। ফুঁ দিয়ে ফেনা সরান, তারপর চুমুক দেন। অবিশ্যি ফেনারও আলাদা স্বাদ আছে।

মিসির আলি ফুঁ দিয়ে ফেনা সরিয়ে চুমুক দিলেন। তাঁর শরীর গুলিয়ে উঠল। অতিরিক্ত মিষ্টি। বাসি ফুলের গন্ধের মতো গন্ধ। গ্লাসে দ্বিতীয় চুমুক দেবার প্রশ্নই ওঠে না।

তরিকুল ইসলাম হাসিমুখে বললেন, খেতে কেমন বলুন। অমৃত না? রস আগুনে জ্বাল দিয়ে ঘন করে বিকেলে এক প্লাস দেব। দেখবেন কী অবস্থা। খেজুর গুড়ের গন্ধ ছাড়বে, মোহিত হয়ে যাবেন। গ্লাস নিয়ে বসে আছেন কেন, চুমুক দিন।

মিসির আলি দ্বিতীয় চুমুক দিলেন। এই বস্তু যে তাঁর পক্ষে খাওয়া সম্ভব না, তা তিনি কীভাবে বলবেন বুঝতে পারছেন না। 'না' বলতে পারা মস্ত বড় গুণ। মিসির আলি এই গুণ থেকে বঞ্চিত। তিনি কারোর মুখের উপরই না বলতে পারেন।

তরিকুল ইসলাম বললেন, রসটা এক চুমুকে নামিয়ে দেন। আমি চা নিয়ে আসছি। গরম গরম চা খান। ঠাণ্ডার পর গরম চার তুলনা হয় না। নাশতা দিতে একটু দেরি হবে। পিঠা তৈরিতে সামান্য সমস্যা হচ্ছে। যাই চা নিয়ে আসছি।

মিসির আলি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আছেন। কুয়াশার ভেতর মানুষটা অদৃশ্য হওয়া মাত্র মিসির আলি হাতেীয় গ্লাসের রস উলটে দিলেন। তার ঢাকায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে। ছায়া ঢাকা ঘুঘু ডাকা গ্রাম তেমন পছন্দ হচ্ছে না। শহরবাসী হওয়ার এই এক সমস্যা। ভোরবেলা চায়ের কাপের সঙ্গে পত্রিকা লাগে। ভালো বাথরুম লাগে। রাতে বই পড়ার জন্য টেবিল ল্যাম্পের আলো লাগে।

তরিকুল ইসলামের গ্রামের বাড়িতে শহরের অনেক সুযোগ-সুবিধাই আছে। আধুনিক ধাঁচের দোতলা পাকা বাড়ি। পল্লীবিদ্যুৎ না থাকলেও সোলার প্যানেলে ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয়। সেই ইলেকট্রিসিটিতে পাখা চলে, বাতি জ্বলে এবং টিভি চলে। এমন এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে সোলার এনার্জি দেখে মিসির আলি অবাক হয়েছিলেন। তরিকুল ইসলামের কথায় অবাক ভাব দূর হল।

এইসব আমার ছেলের করা। সে ইনঞ্জিনিয়ায়। জার্মানির এক ফার্মে কাজ করে। বাড়িঘর সব তার বানানো। তবে আপনার কাছে হাতজোড় করছি ছেলের কী নাম জিজ্ঞেস করবেন না। গত এপ্রিল মাসের সাত তারিখ থেকে এই বাড়িতে তার নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে তার নাম উচ্চারণ করবে তার মুখ দর্শন করব না।

মিসির আলি বললেন, ছেলে এপ্রিল মাসের সাত তারিখ বিদেশী বিয়ে করেছে এই জন্য?

তরিকুল ইসলাম অবাক হয়ে বললেন, আপনার অসম্ভব বুদ্ধি। ঠিকই ধরেছেন। ইহুদি এক মেয়েকে বিয়ে করেছে। কত বড় স্পর্ধা। দেশে থাকলে বাটা কোম্পানির জুতা দিয়ে পিটাতাম। আপশোঁস দেশে নাই। তার দেশে ফেরার উপায়ও নাই। আমি চিঠি লিখে

জানিয়েছি-যেদিন সে আসবে সেদিন আমি এবং আমার স্ত্রী কাঁঠাল গাছে দড়ি ঝুলিয়ে ফাঁস নেব।

মিসির আলিকে থাকার জন্য দোতলার বড় একটা ঘর দেয়া হয়েছে। ঘরের লাগোয়া দক্ষিণমুখী বারান্দা। বারান্দায় ইজিচেয়ার পাতা। বারান্দা থেকে দূরের নদী দেখা যায়। নদীর নাম রায়না। বারান্দা ঘেঁধে বিশাল এক কদম গাছ। গাছ ভর্তি বলের মতো ফুল। কদম বর্ষার ফুল। শীতকালে কদম গাছে শত শত ফুল ফুটবে ভাবাই যায় না। মিসির আলির ধারণা, গাছটার জিনে কোনো গণ্ডগোল হয়েছে। যে কারণে তার সময়ের টাইমটেবিল এলেমেলো হয়ে গেছে। অনেক পশু-পাখির ক্ষেত্রেই এরকম হয়। মিসির আলি যখন ঢাকার জিগাতলায় থাকতেন, তখন একটা কোকিল বৈশাখ-চৈত্র মাসে ডাকত। কোকিল। হিমালয় অঞ্চলের পাখি। বসন্তকালে দুডাকাডাকি করে গরমের সময় তার হিমালয় অঞ্চলে চলে যাবার কথা। সে থেকে গিয়েছে এবং তার অবস্থান জানানোর জন্য গরমকালে ডাকাডাকি করছে।

এই কদম গাছটাও হয়তো টাইমটেবিল নষ্ট হওয়া গাছ। অবিশ্যি এমনও হতে পারে যে এই কদম অন্য কোনো ভ্যারাইটির। আজকাল সামার ভ্যারাইটির টমেটো গাছ পাওয়া যাচ্ছে। টমেটো গরমকালে ফলে।

মিসির আলি রোজই ভাবেন হেডমাস্টার সাহেবকে কদম গাছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। মনে থাকে না।

হেডমাস্টার সাহেবের সঙ্গে মিসির আলির কোনো পূর্ব পরিচয় নেই। তাঁর প্রিয় শহর ছেড়ে গ্রামের এই বাড়িতে থাকতে আসার কারণ এক পাতার একটা চিঠি। চিঠিটা তার ছাত্রের লেখা।

শ্রেদ্ধেয় স্যার,
আমার সালাম নিন। আমি আপনার সরাসরি ছাত্র। আপনি আপনার কোনো ছাত্রের নামই মনে রাখেন না। কাজেই নিজের পরিচয় দেয়া অর্থহীন। তারপরেও নাম বলছি। আমার নাম ফারুক। একটা সরকারি কলেজে সাইকোলজি পড়াই।
আপনি সারা জীবন অতিপ্রাকৃতের সন্ধান করেছেন। অবিশ্বাস্য সব ঘটনার বিশ্বাসযাগ্যো লৌকিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং আমাদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন লজিক ব্যবহারে। অন্যদের কথা জানি না, আমি চেষ্টা করেছি এবং এখনো করছি।
আমি আপনাকে ব্যাখ্যার অতীত কিছু ব্যাপারের সঙ্গে পরিচয় করাতে চাচ্ছি। হাতজোড় করছি কইলাটি ধর্মর একটা গ্রামের হেডমাস্টার তরিকুল ইসলাম সাহেবের বাড়িতে কয়েকটা দিন কাটাতে। উনি আমার শ্বশুর। সরল ধরনের মানুষ। কিন্তু খুবই ভালোমানুষ। তিনি কথা বেশি বলেন, এটা একটা বড় সমস্যা। আপনার মতো মানুষের কাছে এই সমস্যা কোনো সমস্যাই না। ঐ বাড়ির সমস্ত ঘটনা একটি তরুণীকে কেন্দ্র করে। তার নাম আয়না। আয়না আমার স্ত্রী। আমরা এখন আর একসঙ্গে বাস করছি না। আলাদা থাকছি। তবে আমাদের মধ্যে কোনো ডিভোর্স হয় নি। হবার কোনো সম্ভাবনাও নেই। স্যার আপনি কি যাবেন? অল্প কিছু দিন থাকবেন। গ্রাম কইলাটি। পো: অ রোয়াইলবাড়ি। থানা কেন্দুয়া। জেলা নেত্রকোনা।
বিনীত
আহমেদ ফারুক।

কইলাটিতে দুদিন পার হয়েছে। আজ তৃতীয় দিনের শুরু। মিসির আলি কোনো অতিপ্রাকৃতের সন্ধান পান নি। কুয়াশায় ঢাকা গ্রাম। সন্ধ্যা হতেই মশার গুনগুন। গারো পাহাড় থেকে উড়ে আসা শীতের বাতাস। গরম মোজা, কানটুপি এবং ভারী চাদরও সেই হাওয়া আটকাতে পারে না। ঘুমুতে যাবার আগে আগে তরিকুল ইসলাম গরম পানি ভর্তি দুটা বোতল লেপের নিচে রেখে যান। তাতে ঠাণ্ডা লেপের ভেতর ঢোকার প্রক্রিয়া খানিকটা সহনীয় হয়।

তরিকুল ইসলাম যত্নের কোনো ত্রুটি করছেন না। রোজ রাতে ঘি চপচপ পাোলাও খেতে হচ্ছে। মিসির আলি কয়েকবারই জানিয়েছেন পোলাও খাদ্যটি তার অপছন্দের। তিনি ডালভাত দলের মানুষ। তরিকুল ইসলাম চোখ কপালে তুলে বলেছেন, আপনি আমার জামাইয়ের শিক্ষক। আপনাকে ডালভাত খাওয়াব এটা কী বললেন?

ভাই আমি পোলাও খেতে পারি না। আমার পেটে সহ্য হয় না। ডাক্তারের নিষেধ আছে।

ডাক্তারের নিষেধ থাকলে কিছু করার নেই। পোলাওয়ের চালের ভাত করব। তবে সঙ্গে পোলাও থাকবে। শোভা হিসেবে থাকবে। চায়ের চামচে এক চামচ হলেও খাবেন।

মিসির আলি চায়ের চামচে এক চামচ করে পোলাও খেয়ে ভাত খাচ্ছেন। আদরকেও যে কেউ অত্যাচারে পরিণত করতে পারে, মিসির আলির এই অভিজ্ঞতা ছিল না।

সূর্য উঠেছে। সূর্যের প্রথম আলো গায়ে মাখতে ভালো লাগছে। তরিকুল ইসলাম চা দিয়ে গেছেন। এই চায়ের কাপও গ্লাসের মতো জাম্বো সাইজ। ঘন লিকারের দুধ চা। খেতে ভালো। চিনির পরিমাণ ঠিক আছে। ঐটা বিস্ময়কর ব্যাপার। গ্রামের মানুষরা চায়ে বেশি চিনি খেতে পছন্দ করে। চায়ের উপর ভাসন্ত সর থাকাকে তারা উত্তম চায়ের অনুষঙ্গ বিবেচনা করে।

তরিকুল ইসলাম বললেন, আরাম করে চা খান। নাশতার দেরি হবে ভাইসাব। নতুন চালের গুড়ি করা হচ্ছে। সেই চালের গুড়িতে পিঠা হবে। আগেরগুলো ফেলে দিতে হয়েছে।

মিসির আলি বললেন, আমার যে পিঠা খেতেই হবে তা কিন্তু না। আলু ভাজি দিয়ে পাতলা দুটা রুটিই আমার জন্য যথেষ্ট।

তরিকুল ইসলাম বললেন, ভাই সাহেব। আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন? আপনি আমার জামাইয়ের শিক্ষক। আপনাকে খাওয়াব আলু ভাজি রুটি? এরচে আমার গালে একটা থাপ্পড় মারেন।

মিসির আলি বললেন, ঠিক আছে। যা খাওয়াতে চান খাওয়ান।

দুপুরে চিতল মাছ খাওয়াব। বিলের চিতল। শীতকাল তো তেলে ভর্তি। আমার ছোটখালাকে খবর দিয়েছি। তিনি এসে রোধে দিয়ে যাবেন। আমার স্ত্রী রান্নাবান্নায় বড়ই আনাড়ি। একবার তের কেজির একটি বোয়াল মাছ এনেছিলাম এক পিস মুখে দিতে পারি নাই। এমন লবণ দিয়েছিল খেতে গিয়ে মনে হল নোনা ইলিশ।

আপনার মেয়ে রাধতে পারে না?

আয়নার কথা বলছেন? ওর তো ভাই মাথার ঠিক নাই! ও রাধবে কী? দুই তিন দিন একনাগাড়ে দরজা বন্ধ করে পড়ে থাকে। কিছু খায় না। পানিও না। তারপর দরজা খুলে বের হয়। খুব স্বাভাবিক।

গত দুদিন কি সে দরজা বন্ধ করে ছিল? হ্যা। তিন দিন ধরেই দরজা বন্ধ। হিসেব মতো আজ্ঞ দরজা খোলার কথা। দরজা খুললেই আপনার কথা বলব।

মিসির আলির সামান্য খটকা লাগল। একটি মেয়ে তিন দিন দরজা বন্ধ করে আছে তার বাবা-মার এই কারণেই অস্থির থাকার কথা। তরিকুল ইসলামের বা তার স্ত্রীর চোখেমুখে কোনো অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে না। তঁরা দুজনই মেহমানের যত্ন নিয়ে অস্থির। এমনকি হতে পারে-মেয়ের পাগলামি দেখে দেখে তারা অভ্যস্ত। কোনো বাবা-মা”ই সন্তানের অস্বাভাবিকতায় অভ্যস্ত হবেন না।

মিসির আলি খানিকটা অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, হেডমাস্টার সাহেব! মেয়েটা কি আপনার নিজের না পালক কন্যা?

তরিকুল ইসলাম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ভাই আপনার বুদ্ধি মারাত্মকেরও উপরে। মেয়েটা যে আমার নিজের না এই খবর কেউ জানে না। আমার জামাইও জানে না। জানানো উচিত ছিল, জানাই নাই। পালক কন্যা কেউ বিয়ে করে না। এমন ভালো পাত্র হাতছাড়া হয়ে যাবে এই ভয়েই জানাই নি।

গ্রামের লোকদের তো জানার কথা।

কেউ জানে না। কেন জানে না সেটা একটা ইতিহাস। পরে আপনাকে বলব। ভাই সাহেব আমি পিঠার আয়োজন দেখি, আপনি চা খান।

হলুদ রঙের লম্বা লেজওয়ালা একটা পাখি ওড়াউড়ি করে শীত কাটাচ্ছে। পক্ষী সমাজে কেউ একা থাকে না। সবারই সঙ্গী থাকে। এই পাখিটা এক কেন? তার সঙ্গী কি কাছেই কোথাও বসে আছে। মিসির আলি হলুদ পাখির সঙ্গী খুঁজতে ঘাড় ফেরাতেই এক তরুণীকে দেখলেন। সে এসে মিসির আলির পা ছুঁয়ে কদমবুসি। করল। নরম গলায় বলল, স্যার আমি আয়না।

মেয়েটির পরনে সাধারণ একটু সুতি শাড়ি। প্রচণ্ড শীতে খালি পা। গায়ে চাদর নেই। মিসির আলি কিছু সময় মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মেয়েটিকে এই পৃথিবীর মেয়ে বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে অন্য কোনো ভুবনের। পৃথিবীর কোনো মেয়ে এত রূপ নিয়ে জন্মায় না।

মিসির আলি বললেন, আয়না কেমন আছ?

ভালো আছি চাচা।

আমি তোমার স্বামীর একসময়কার শিক্ষক।

চাচা আমি জানি। অনেক আগেই আপনার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন ছিল। আটকা পড়ে গিয়েছিলাম।

কোথায় আটকা পড়ে গিয়েছিলো?

আয়না হাসল, জবাব দিল না।

খালি পায়ে হাঁটছ। শীত লাগছে না?

শীত লাগছে। বাইরে এত ঠাণ্ডা বুঝতে পারি নি।

ঘরে যাও। পায়ে স্যান্ডেল, পর । পায়ে চাদর দাও।

জি আচ্ছা চাচা। পরে আপনার সঙ্গে কথা হবে।

আয়না চলে যাচ্ছে। মিসির আলি তাকিয়ে আছেন। তিনি চোখ ফেরাতে পারছেন না। শীতের কুয়াশা ঢাকা সকাল। লম্বা লেজের হলুদ পাখি। কিন্নরীর মতো এক তরুণী। সব মিলিয়ে মিসির আলির মনে ঘোরের মতো তৈরি হল।

সকালের নাশতা তৈরি হয়েছে। শুধু ভাপা পিঠা না। পরোটা আছে। পরোটার সঙ্গে ঝাল মুরগির মাংস এবং ছিটা পিঠা। মিসির আলি সকালে মিষ্টি খেতে পারেন না। বাধ্য হয়ে তাঁকে পিঠা খেতে হচ্ছে। এত আয়োজন করে পিঠা তৈরি হয়েছে। খাবেন। না বলাটা অন্যায় হবে। মিসির আলির নিজেকে জাপানি জাপানি মনে হচ্ছে। জাপানির না বলতে পারে না। এমনই লাজুক জাতি। তবে সম্প্রতি একটা বই জাপান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বইয়ের শিরোনাম-জাপানিরা এখন না বলা শিখেছে। বইটা জোগাড় করে পড়তে পারলে ভালো হতো।

ভাই সাহেব! পিঠা কেমন হয়েছে?

ভালো হয়েছে। অসাধারণ।

আপনার খাওয়া দেখে তো সে রকম মনে হচ্ছে না। একটা পিঠা নিয়ে বসে আছেন। মিনিমাম তিনটা পিঠা শেষ করার পর পরোটা মাংস ।

মিসির আলি খাদ্য আলোচনার মোড় ঘুরাবার জন্য বললেন, আপনার মেয়ে আয়নার সঙ্গে ভোরবেলায় দেখা হয়েছে। অতি রূপবতী মেয়ে।

তরিকুল ইসলাম বিক্ষিত গলায় বললেন, রূপবতী?

আমি এমন রূপবতী মেয়ে দেখি নি। গায়ের রঙ দুধে আলতায়।

মেয়েটা তো কালো।

কালো?

জি বেশ কালো।

তা হলে অন্য কাউকেই দেখেছি। কিংবা চোখে ভুল দেখেছি। কারণ মেয়েটা বলেছে সে আয়না।

কেউ কি আপনার সঙ্গে ফাজলামি করেছে? ফাজলামি কে করবে? ফাজলামি করার মতো মেয়ে তো এই গ্রামে নাই। আচ্ছা আমি দেখি আয়না ঘর থেকে বের হয়েছে কি না। বের হলো নিয়ে আসছি।

তরিকুল ইসলাম আয়নাকে নিয়ে ফিরলেন। কালো একটা মেয়ে। সাধারণ চেহারা! নাক মোটা। গালের হনু সামান্য উঁচু হয়ে আছে।

তরিকুল ইসলাম বললেন, তোর জামাইয়ের শিক্ষক। কদমবুসি কর।

আয়না স্পষ্ট গলায় বলল, একবার কদমবুসি করেছি। বাবা। সকালে স্যারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আর তোমরা স্যারকে এক গাদা পিঠা দিয়ে বসিয়ে রেখেছি কেন? স্যার নাশাতায় মিষ্টি খেতে পারেন না। মাংস পরোটা দাও। এখন থেকে স্যারের খাবারদাবারের সব দায়িত্ব আমার।

আয়না পরোটা এবং মাংসের বাটি নিয়ে মিসির আলির সামনে দাঁড়াল। মিসির আলি আচমকা ধাক্কার মতো খেলেন। ভোরবেলায় দেখা সেই মেয়ে। গায়ের রূপ জোছনার মতো ছড়িয়ে পড়ছে। বড় বড় কালো চোখ। সেই চোখে পাপড়ির ছায়া। অভিমানী পাতলা ঠোঁট। মিসির আলি চোখ নামিয়ে নিলেন। দীর্ঘ সময় ভ্রান্তির দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না।

সামনে দাঁড়ানো মেয়েটি কি রক্ত মাংসের মানুষ?

নাকি মায়া?

বাস্তব জগতের পুরোটাই মায়া। একটাই সমস্যা মায়া ধরার কোনো পথ নেই। আইনষ্টাইনের কথা। অতি বাস্তববাদী বিজ্ঞানীর পরাবাস্তব উক্তি।

আয়না বলল, স্যার পরোটা দেই?

মিসির আলি বললেন, দাও।

তরিকুল ইসলাম বললেন, তোর স্যার বলছিলেন তোর মতো রূপসী মেয়ে তিনি নাকি দেখেন নাই।

আয়না বলল, স্যার আমাকে আদর করে বলেছেন। আদর করে আমরা ভালো ভালো কথা বুলি।

তরিকুল ইসলামের স্ত্রী সালেহা বললেন, কেউ কেউ স্যারের মতো বলেন। ভিন গ্রামের এক ফকিরনী এসে তোকে দেখে রাজরানী রাজরানী বলে কত হইচই শুরু করল। মনে নাই?

আয়না বলল, বেশি ভিক্ষা পাওয়ার জন্য বলেছে মা। ফকিরনীরা খুব চালাক হয়। কী বললে কে খুশি হবে সেটা জানে!

মিসির আলি নিঃশব্দে নাশতা শেষ করলেন। চলে গেলেন নিজের ঘরের সামনের বাক্সান্দায়। চা-চঁটা আলাদা খাবেন। তার নিজের মাথা খানিকটা এলোমেলো লাগছে। এলোমেলো ভাবটা দূর করতে হবে। আয়না এল চা নিয়ে। তার সামনে বসল। মিসির

আলি তাকালেন আয়নার দিকে। তাকে সাধারণ দেখাচ্ছে। গায়ের রঙ কালো। চাপা নাক। মোটা ঠোঁট। থুতনিতে আঁচিলের মতো আছে। থুতনির আঁচিল আগে লক্ষ করেন নি।

কোনো অর্থেই এই মেয়েকে রূপবতী বলা যাবে না। তা হলে সমস্যাটা ঠিক কোন জায়গায়? দেখার ভুল? আলোছায়ার কোনো খেলা? প্রকৃতি নানান খেলা খেলে। আলোছায়ার খেলা তার একটি। তবে প্রকৃতি প্রশ্নের উর্ধ্বে না। তাকেও প্রশ্নের জবাব দিতে হয়।

স্যার কি চিন্তা করছেন?

মিসির আলি হেসে বললেন, তেমন কিছু চিন্তা করছি না।

স্যার, আমার নামটা সুন্দর না? আয়না।

খুব সুন্দর নাম।

এই নাম কেন রাখা হয়েছে জানেন? ছোটবেলায় আমার খুব আয়নপ্রীতি ছিল। সারাক্ষণ আয়নায় নিজেকে দেখতাম। মনে করুন। আমি খুব কান্নাকাটি করছি। আমার হাতে একটা আয়না ধরিয়ে দিলেই আমি চুপ।।

মিসির আলি বললেন, আয়নপ্রীতি কি এখন নেই?

না। এখন আছে আয়নাভীতি। আমার ঘএর আয়না কালো পর্দায় ঢাকা। কতদিন যে আয়নায় নিজের মুখ দেখি না।

মিসির আলি বললেন, মনে হচ্ছে আয়না নাম তোমাকে পরে দেয়া হয়েছে। তোমার আসল নাম কী?

কুলসুম।

তোমার স্বামী তোমাকে কী নামে ডাকে? কুলসুম না আয়না?

সে কুলসুম নামের ল টা ফেলে দিয়ে কুসুম ডাকে। তবে বিয়ের কাবিননামায় আমার নাম কুলসুম থাকলেও আমি সিগনেচার করেছি ‘আয়না’ নাম।

আয়না তোমার খুব পছন্দের নাম?

জি।

তোমার রূপ সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? তুমি অতি রূপবতীদের একজন, না সাধারণ বাঙালি তরুণীদের একজন?

আয়না এই প্রশ্নের জবাব দিল না। হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে রইল। মনে হচ্ছে প্রশ্ন শুনে সে মজা পাচ্ছে।

মিসির আলি বললেন, প্রশ্নটার জবাব দাও।

দিতেই হবে?

দিতে না চাইলে দেবে না। তোমার রূপ সম্পর্কে তোমার স্বামীর কী ধারণা?

আয়না নিচু গলায় বলল, বাসররাতে সে আমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। ভোরবেলায় হতভম্ব। এখনো সে মাঝে মাঝে মুগ্ধ হয়। মাঝে মাঝে হতভম্ব হয়।

তাতে তুমি মজা পাও?

পাই।

এই মুহূর্তে আমি একটা সংখ্যা ভাবছি। সংখ্যাটা কত?

আট।

একটা পাখির কথা ভাবছি। পাখিটার নাম কী?

স্যার আপনি দুটা পাখির কথা ভাবছেন। একটা ঘুঘু আর একটা কোকিল। একটা কোকিল। গরমের সময় ডাকত। সে পাখিটা কেন হিমালয়ে যাচ্ছে না সেটা চিন্তা করছেন। এখন আবার অন্য একটা পাখির কথা ভাবছেন। হলুদ পাখি লম্বা লেজ। একা থাকে।

তুমি কি সবার চিন্তা বুঝতে পার?

পারি। কিন্তু বুঝার চেষ্টা করি না। মানুষের বেশিরভাগ চিন্তাই কুৎসিত।

মিসির আলি বললেন, আমি তোমার ব্যাপারটা বুঝতে চাই তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?

আয়না বলল, স্যার সাহায্য করব। আমি নিজেও বুঝতে চাই। আপনার ছাত্রও বুঝতে চেষ্টা করেছিল। সে আমার বিষয়ে অনেক কিছু খাতায় লিখে রেখেছে। খাতাটা আমার কাছে। আপনি পড়তে চাইলে আপনাকে দেব। পড়তে চান?

চাই। তুমি নিজে কি তোমার বিষয়ে কিছু লিখেছি। ডায়েরি জাতীয় লেখা?

লিখেছি, তবে আপনাকে পড়তে দেব না।

তোমার স্বামীকে পড়তে দিয়েছিলে?

না। স্যার, আপনার আরেক কাপ চা খেতে ইচ্ছা করছে। চা নিয়ে আসি? চায়ের সঙ্গে সিগারেট ধরাতে ইচ্ছা করছে। সিগারেট তো তো আপনার সঙ্গে নেই। সিগারেট আনিয়ে দেই?

দাও।

কোন ব্র্যান্ডের সিগারেট আনব?

মিসির আলি ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কোন ব্র্যান্ডের সিগারেট আনাবে তা তুমি জান। কেন জিজ্ঞেস করছ?

আয়না। হাসিমুখে উঠে গেল। মিসির আলি তাকিয়ে আছেন নদীর দিকে। নদীর নাম রায়না। একসময় নাকি প্রমত্তা ছিল। স্টিমার যাওয়া আসা করত। এখন মরতে বসেছে। মৃত্যু সবার জন্যই ভয়ংকর।

নদীর নাম রায়না।

সে কোথাও যায় না।

সমুদ্রকে পায় না।

মিসির আলি নড়েচড়ে বসলেন। তার মাথায় ছড়া পাঠ হচ্ছে। পাঠ করছে আয়না নামের মেয়েটি। এর মানে কী? জীবনে প্রথম মিসির আলি হতাশ এবং পরাজিত বোধ করলেন।

The old man and the sea বইটিতে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে একটা বিখ্যাত লাইন লিখেছিলেন Man can be destroyed but not defeated. লাইনটা ভুল। মানুষকে অসংখ্যাবার পরাজিত হতে হয়। এটাই মানুষের নিয়তি। পরাজিত হয় না পশুরা। এটাও বোধ হয় ঠিক না। পশুরাও পরাজিত হয়। সিংহ এবং বাঘের যুদ্ধে একজনকে লেজ গুটিয়ে পালাতে হয়।

স্যার, আপনার চা। সিগারেট।

আয়না চেয়ারে বসতে যাচ্ছিল। মিসির আলি বললেন, আয়না তুমি এখন যাও। আমি কিছুক্ষণ একা থাকব।

আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?

না।

আপনার ছাত্র সব সময় বলত আপনার মতো বুদ্ধিমান মানুষ সে জীবনে দেখে নি। আপনাকে আমার দেখার শখ ছিল।

স্বায়ন পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব। এখন না।

স্যার, চা শেষ করে আপনি নদীর পাড় ঘেঁষে হাঁটতে যান, আপনার ভালো লাগবে। একটা পুরোনো বটগাছ আছে। সেখানে বসার জায়গা আছে। আমি ফ্রাস্ক ভর্তি কয়ে চা দিয়ে দেব।

থ্যাংক য়্যু। এখন যাও।

স্যার, যাচ্ছি। একটা কথা বলে যাই? পরাজিত হবার মধ্যেও কিন্তু আনন্দ আছে স্যার!

পরাজয়ের আবার আনন্দ কী?

অবশ্যই পরাজয়ের আলাদা আনন্দ আছে। আনন্দ আছে বলেই প্রকৃতি আমাদের জন্য পরাজয়ের ব্যবস্থা রেখেছে। মৃত্যু একটা পরাজয়। সেখানেও আনন্দ আছে। সমাপ্তির আনন্দ।

তুমি পড়াশোনা কতদূর করেছ?

বিএ পাস করেছি। আপনার ছাত্রের খুব ইচ্ছা ছিল আমি এমএ পাস করি। আমার ইচ্ছা হয় নি। স্যার যাই? আপনি সিগারেট ঠোঁটে নিন। আমি ধরিয়ে দেব।

মিসির আলি সিগারেট নিলেন। আয়না ধরিয়ে দিল। আয়নার চোখ আনন্দে ঝলমল করছে।

হলুদ রঙের লম্বা লেজের পাখিটা বারান্দার রেলিংয়ে বসেছে। রেলিংয়ে পাখিটা বসানোর পেছনে কি আয়না মেয়েটার কোনো হাত আছে? কাক এবং চড়ুই ছাড়া আর কোনো পাখি তো মানুষের এত কাছে আসে না। বনের এই অচেনা পাখি এত কাছে এসেছে কেন?

আয়না।

জি স্যার।

এখন কী ভাবছি বল। আয়না কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বলতে পারছি না স্যার। খুবই অবাক হচ্ছি।

মিসির আলি বললেন, তুমি যাতে আমার মাথার ভেতর ঢুকে পড়তে না পার, তার একটা কৌশল বের করেছি। কৌশলটি কাজ করেছে।

আয়না বলল, কৌশলটা কী?

মিসির আলি বললেন, কৌশল তোমাকে জানানো ঠিক না। তারপরেও জানাচ্ছি। আমার হাতের কবিতার বইটার নাম উল্টো করে স্বাক্সবার পড়ছিলাম-বইটার নাম Poems. আমি উল্টো করে পড়ছি Smeop, Smeop.

ব্রেইনে অর্থহীন শব্দ ধারবার বলে জট পাকিয়েছি। মনে হয় এটাই কাজ করেছে।

২. মিসির আলি বটগাছের গুড়িতে

মিসির আলি বটগাছের গুড়িতে বসে আছেন। বসার জন্যে জায়গাটা সুন্দর। অর্ধেক বটগাছ রায়না নদীর উপর। নদীর পানি শিকড়ের মাটির অনেকটাই ধুয়ে নিয়ে গেছে। অসহায় বটবৃক্ষ নিজেকে রক্ষার জন্যে অসংখ্য ঝুরি নামিয়েছে। সে এখনো টিকে আছে। কতদিন টিকবে কে জানে।

প্রথমবারের মতো মিসির আলির মনে হলো তার একটা ক্যামেরা থাকলে ভালো হতো। নদীর উপর দাঁড়িয়ে থাকা বটগাছের ছবি তুলে রাখতেন। ভাতের থালা হাতে নিরন্ন ভিখিরি ছেলের ছবি তুলতে ফটোগ্রাফাররা পছন্দ করেন। এই বিশাল গাছও এক অর্থে ভিক্ষুক। সে বেঁচে থাকার জন্যে করুণা ভিক্ষা করছে নদীর কাছে। যে নদীর নাম রায়না। মিসির আলি আরাম করে বসেছেন। পায়ের নিচের পানির ছলাৎ শব্দ শুনতে ভাল লাগছে। নদীর পানি যদিও সবসময় একই গতিতে বইছে কিন্তু ছলাৎ ছলাৎ শব্দটা থেমে থেমে হচ্ছে। কিছুক্ষণ ছলাৎ ছলাৎ তারপর আর শব্দ নেই কঠিন নীরবতা। এর কারণ কি? আমাদের চারপাশে অমীমাংসিত সব রহস্য।

নদীর নামটাও তো রহস্যের একটা। কে দিয়েছে রায়না নাম? প্রাচীন পৃথিবীতে মানবগোষ্ঠী খণ্ড খণ্ড ভাগ হয়ে নদীর পাশে বসতি করেছে। হঠাৎ কেউ একজন কি সেই নদীকে ব্রহ্মপুত্র নাম দিয়ে দিল। বিশাল এলাকা জুড়ে নদী। সবাই তাকে ডাকছে ব্রহ্মপুত্র নামে। কারণ কি? বটগাছের কথাই ধরা যাক। কে তার প্রথম নাম দিল? সেই নাম কিভাবে ছড়িয়ে পড়ল? এমন তো না কিছু জায়গায় নাম বটবৃক্ষ আবার কিছু জায়গায় হুটবৃক্ষ।

মিসির আলির মাথায় এলোমেলো চিন্তা একের পর এক আসছে। তার ভালোই লাগছে। নামকরণ রহস্যের সমাধান তাকে করতে হবে না। এই দায়িত্ব তাকে কেউ দেয় নি। রহস্যের প্রতি সামান্য কৌতূহল প্রদর্শন করলেই হবে।

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। তাঁর দৃষ্টি এখন পাখিদের কর্মকাণ্ডে। পাখিদের বড় অংশই বিক। তারা মাছ ধরায় ব্যস্ত। দুটা মাছরাঙা দেখা যাচ্ছে। মাছরাঙার প্রধান খাদ্য মাছ। তবে তারা মাছ ধরায় আগ্রহী না। তারা বাঁশের খুঁটিতে পাশাপাশি বসে আছে। কিছুক্ষণ পরপর একজন আরেক জলকে দেখছে। মাছরাঙা যে এত সুন্দর পাখি তা আগে তিনি লক্ষ করেন নি। ক্যামেরা থাকলে অবশ্যি মাছরাঙার ছবি তুলতেন।

জায়গাটা নির্জন। নদীর পাড় ধরে লোক চলাচল নেই বললেই হয়। নদীতে অনেকক্ষণ পর পর নৌকার দেখা পাওয়া যাচ্ছে। সবই ইনজিনের নৌকা। দ্রুত বিদায় হয়ে যাচ্ছে। গ্রাম-বাংলার শ্লথ জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে।

মিসির আলি চায়ের ফ্লাক্স বের করার জন্যে কাপড়ের ঝুলি খুললেন। আয়না মেয়েটা শুধু যে ফ্ল্যাক্স ভর্তি চা দিয়েছে তা-না এক প্যাকেট বিসকিট দিয়েছে। বিসকিটের নাম Energy. সাদা কাগজ এবং বল পয়েন্ট দিয়েছে। সে কি ভেবেছে মিসির আলি লেখক মানুষ? র্যাক্সিনে বাঁধানো একটা ডায়েরিও দেখা যাচ্ছে। মিসির আলি কৌতূহলী হয়ে ডায়েরি খুললেন। যা সন্দেহ করেছিলেন। তাই। তার ছাত্রের লেখা ডায়েরি। সে তার স্ত্রী আয়না সম্পর্কে লিখেছে।

চমৎকার কোনো জায়গায় বসে ডায়েরি পড়া যায় না। ডায়েরি বা গল্পের বই পড়ার অর্থ প্রসারিত দৃষ্টিকে গুটিয়ে নিয়ে আসা। ডায়েরি পড়ার চেয়ে মিসির আলি অনেক বেশি

আগ্রহবোধ করছেন মাছরাঙা পাখিটার গতিবিধি লক্ষ করায়। এর নাম মাছরাঙা কেন হলো। মাছ খেয়ে সে রাঙা হয়েছে এই জন্যে? তাহলে তো বকের নাম হওয়া উচিত মাছ সাদা। কারণ মাছ খেয়েই সে ধবধবে সাদা হয়েছে।

মিসির আলির চিন্তায় বাধা পড়ল। দুটি মাছরাঙাই হঠাৎ উড়ে গেছে। তাদের উড়ে যাওয়ার পেছনেও ব্যাখ্যা আছে। গ্রামের এক তরুণী মেয়ে নদীতে স্নান করতে এসেছে। সে হয়তো ভেবেছে আশেপাশে তাকে লক্ষ করার মতো কেউ নেই। অর্ধনগ্ন হওয়া যেতে পারে। মিসির আলি খাতা খুলে চোখ সরিয়ে নিলেন। মেয়েটির স্নান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার ছাত্রের লেখা পড়া একটি শোভন কর্ম।

আমার বিয়ে হয় তেইশে শ্রাবণ। ইংরেজি তারিখটা মনে থাকে না। বাংলাটা মনে থাকে কারণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরের দিনটাই আমার বিয়ের তারিখ।

স্ত্রীর নাম কুলসুম। বিয়ের আগে আমি তাকে দেখিনি। দেখার তেমন কৌতূহলও বোধ করি নি। আমার দূর সম্পর্কের এক মামা বিয়ে ঠিক করে দেন। গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার সাহেবের মেয়ে। বিএ পাস করেছে। বিএ'তে ফাস্ট ডিভিশন পেয়েছে। মেয়েটির এই যোগ্যতাই আমার কাছে যথেষ্ট মনে হয়েছে। গ্রামের এক কলেজ থেকে ফাস্ট ডিভিশন পেয়ে গ্র্যাজুয়েট হওয়া সহজ কথা না। মামা মেয়েটির ছবি দেখিয়েছেন। মেয়েটি সুশ্রী। বোঁচা নাক তবে তাতে খারাপ দেখাচ্ছিল না। মামা বললেন, মেয়েটির গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল শ্যামলা। আমি ধরেই নিলাম মেয়ে কালো। বিয়ের পাত্রীর গায়ের রঙ কালো হলে তাকে উজ্জ্বল শ্যামলা ঘলাটাই শিষ্টাচার।

আমি আমার হবু স্ত্রীর গায়ের রঙ বা চেহারা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। তার প্রধান কারণ পাত্র হিসেবে আমি নিচের দিকে। আবার বাবা-মা নেই। বাড়িঘর নেই। চাকরিটাই সম্বল। বাংলাদেশের কোনো বাবা-মা এতিম ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিতে আগ্রহী না। তার চান মেয়ে যেন থাকে শ্বশুর-শাশুড়ির আদরে ও প্রশ্রয়ে। যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সে রকম ঘটে না।

তোইশে শ্রাবণ সোমবার সন্ধ্যায় আমার বিয়ে হলো। ঠিক হলো মেয়ে বাবার বাড়িতেই থাকবে। কলেজ থেকে কোয়ার্টার পাওয়ার পর মেয়ে উঠিয়ে নেয়া হবে।

বাসরের আয়োজন হলো মেয়ের বাবার বাড়িতে। বাড়িটা সুন্দর। দোতলা পাকা দালান। যে ঘরে বাসর সাজানো হলো সে ঘরটা বেশ বড়। পাশে রেলিং দেয়া বারান্দা। বারান্দায় দাঁড়ালে নদী দেখা যায়। নদীর নাম রায়না।

বিয়ে পড়ানো শেষ হওয়ার পর কিছু মেয়েলি আচার আছে। একই গ্লাসে সরবত খাওয়া। আয়নায় মুখ দেখা ইত্যাদি। সব আচারই পালন করা হলো শুধু আয়নায় মুখ দেখার অংশটা বাদ গেল। আমাকে জানানো হলো- মেয়ে আয়নায় মুখ দেখবে না। কারণ সে খুব আয়না ভয় পায়। আমার সামান্য খটকা লাগিল। মেয়ে আয়না ভয় পাবে কেন? সে সিজিওফ্রেনিক না তো? কিছু সিজিওফ্রেনিক নিজের মুখোমুখি হতে ভয় পায় বলে আয়নার সামনে দাঁড়াতে পারে না। তাদের মনোবিশ্লেষণের একটা পর্যায়ে বড় বড় আয়নার সামনে দাঁড় করানো

হয়। নিজের মুখোমুখি হওয়াতে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়। এই বিষয়ে আমার শিক্ষক মিসির আলি সাহেবের একটি পেপার আছে। নাম Mind Mirror game.

কুলসুমের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হলো বাসর রাতে। আমার এক বৃদ্ধ নানীশাশুড়ি তাকে নিয়ে এলেন। গ্রামের বৃদ্ধারা অশ্লীল কথা বলতে পছন্দ করে। এই বৃদ্ধাও তার ব্যতিক্রম না। তিনি ধাক্কা দিয়ে কুলসুমকে আমার গায়ে ফেলে দিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, জামাই! জিনিস দিয়া গেলাম। শাড়ি, ব্লাউজ খুঁইল্যা দেইখা নেও সব ঠিক ঠিক আছে কি-না। এই বাক্যটির পর তিনি আরো একটি কুৎসিত বাক্য বললেন। সেই বাক্যটি লেখা সম্ভব না। ঘেন্নায় আমার শরীর প্রায় জমে গেল। আমি আমার স্ত্রীর দিকে লজ্জায় তাকাতেও পারছিলাম না। না জানি মেয়েটা কি মনে করছে। নানীশাশুড়ি ঘর থেকে বের হওয়া মাত্র কুলসুম। মাথার ঘোমটা সরিয়ে স্পষ্ট এবং শুদ্ধ ভাষায় বলল, তুমি নানীজনের কথায় কিছু মনে করো না। গ্রামের এক বৃদ্ধার কাছ থেকে সুরুচি আশা করা যায় না।

আমি হতভম্ব হয়ে কুলসুমের দিকে তাকালাম। হতভম্ব হবার প্রধান কারণ— আমি আমার সমগ্র জীবনে এত রূপবতী মেয়ে দেখিনি। নিখুঁত সৌন্দর্য সম্ভবত একেই বলে। হেলেন অব ট্রয়, কুইন আব সেবা, ক্লিওপট্রা এরা কেউ এই মেয়েটির চেয়েও সুন্দর তা হতেই পারে না। আমি নিজের অজান্তেই বললাম, Oh my God. কি দেখছি।

কুলসুম বলল, আমাকে দেখছি। আর কি দেখবে?

আমি এখন খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে কুলসুমকে দেখছি। কোনো হিসাবই মিলছে না। গ্রামে বড় হওয়া একটা মেয়ে আগ বাড়িয়ে বিয়ের রাতে স্বামীর সঙ্গে তুমি তুমি বলে কথা বলা শুরু করবে না। চোখে চোখ রেখে স্বাভাবিক ভাবে বসে থাকবে না। সারাক্ষণ জড়সড় হয়ে

থাকার কথা। আমার চিন্তা-ভাবনা সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। কি বলব বুঝতে পারলাম না।

কুলসুম বলল, তোমার গরম লাগছে না?

আমি তখন প্রবল ঘোরে। গরম-শীতের কোনো অনুভূতি নেই। তারপরেও বললাম, হুঁ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বুম বৃষ্টি নামবে। এমন ঠাণ্ডা লাগবে যে রীতিমত শীত করবে।

আমি বললাম, হুঁ।

কুলসুম বলল, বৃষ্টি নামলে আমরা বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখব।

আমি বললাম, আচ্ছা।

আমাদের এই বারান্দা থেকে নদী দেখা যায়। নদীর নামটা সুন্দর। তোমাকে কি কেউ নদীটির নাম বলেছে?

আমি বললাম, বলেছিল। এখন ভুলে গেছি।

নদীর নাম রায়না।

আমি বললাম, ও আচ্ছা রায়না।

কুলসুম বলল, রায়না'র সঙ্গে কিসের মিল বলতো।

আমি বললাম, জানি না।

কুলসুম বলল, আয়না। রায়না আয়না। আমার ডাক নাম কিন্তু অয়না।

তাই না-কি?

হুঁ।

আমি প্রায় অপলকেই তাকিয়ে আছি আয়না নামের মেয়েটির দিকে। সে সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলে যাচ্ছে। কথা শুনছি। বার বার মনে হচ্ছে এই মেয়েটির প্রতিটি কথার অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা ধরতে পারছি না। মাথার ভেতর আয়না এবং রায়না ঘুরপাক খাচ্ছে–

নদীর নাম রায়না
সেই নদীতে সিনান করে।
অবাক মেয়ে আয়না।

আমি অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছি। ছড়া কবিতা এইসব কখনো আমার মাথায় আসে না। তাহলে ছড়া তৈরি করছি কেন? সমস্যাটা কি।

আয়না। হাসিমুখে বলল, দেখ দেখ বৃষ্টি নেমেছে।

ঘরের পর্দা কাঁপছে। জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। জানালার লাগোয়া কদমগাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দ। আয়না বলল, চল বারান্দায় বসি। সে এসে হাত ধরে আমাকে দাঁড় করাল। আমার ঘোর আরো প্রবল হলো।

বারান্দা অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে। তার নীল আলোয় চারদিক স্পষ্ট হয়ে আবার অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। আমরা দু'জন পাশাপাশি দুটা বেতের চেয়ারে বসে আছি। আমার রীতিমত শীত লাগছে। আয়না একটা চাদর এনে আমার গায়ে দিয়েছে। বাইরে ঠাণ্ডা। চাদরের নিচে আরামদায়ক উষ্ণতা। আয়না বলল, তোমার কি ঘুম পাচ্ছে?

হুঁ।

আয়না বলল, ঘুম পেলে ঘুমাও। সারাদিন নানান ধকল গেছে। তুমি ক্লান্ত হয়ে আছ। ঘুম পাবারই কথা। তুমি আরাম করে ঘুমাও তো। রেস্ট নাও। আমি ডেকে দেব।

আচ্ছা।

আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম। আমার ঘুম ভাঙলো পরদিন ভোরে। আয়না আমাকে ডেকে তুলল। তার হাতে চায়ের কাপ। আমি প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। কারণ আমার সামনে যে আয়না দাঁড়িয়ে আছে সে রাতের আয়না না। সাধারণ বাঙালি এক তরুণী। গায়ের রং শ্যামলা। বোঁচা নাক। আমি প্রচণ্ড দ্বিধার মধ্যে পড়লাম। গত রাতে যে আয়নাকে দেখেছি, সে সত্যি না এখন যে আয়না আমার সামনে দাড়িয়ে আছে সে সত্যি? আমি কি কোনো মানসিক সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি? সিজিওফ্রেনিক রোগীর মতো হেলুসিনেশন হচ্ছে?

আয়না বলল, তুমি পানি দিয়ে কুলি করে চা খাবে না-কি বাসিমুখে চ্য খাবে?

আমি জবাব দিলাম না। আয়নার হাত থেকে চায়ের কাপ নিলাম। আয়না বলল, ঠিক আছে বাসি মুখেই চা খাও। তারপর হাত মুখ ধুয়ে নিচে যাও। বাবা নাশতা নিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। বেলা। কিন্তু অনেক হয়েছে। সাড়ে ন'টা বাজে।

নাসতার টেবিলে আয়নার বাবা চিন্তিত গলায় বললেন, তোমার কি শরীর খারাপ করেছে না-কি?

খারাপ করেছে না-কি?

আমি বললাম, না।

রাতে ভালো গরম পড়েছিল। গরমে মনে হয়।ঘুমাতে পার নাই।

আমি বললাম, বৃষ্টি নামার পর সব ঠাণ্ডা। আরাম করে ঘুমিয়েছি।

উনি অবাক হয়ে বললেন, বৃষ্টি মানে? বৃষ্টি হয় নাই তো।

আমি অবাক হয়ে বললাম, বৃষ্টি হয় নাই?

তিনি আমার শাশুড়িকে ডেকে বললেন, জামাই কি বলছে শোন। কাল রাতে না-কি বৃষ্টি হয়েছে।

আমার শাশুড়ি বললেন, ‘হপন’ দেখেছে।

এই পর্যন্ত পড়ে মিসির আলি খাতা বন্ধ করলেন।

গ্রামের মেয়েটির স্নান শেষ হয়েছে। সে চলে গেছে। মাছরাঙা পাখি ফিরে এসেছে। সে বসেছে ঠিক আগের জায়গায়। ডাইনিং টেবিলে কে কোন চেয়ারে বসবে সেটা যেমন ঠিক করা থাকে পাখিদের ক্ষেত্রেও হয়ত তাই। আমি বসব এই খুঁটিতে তুমি বসবে ঐটায়।

মিসির আলি সাহেব! আপনি এইখানে। আপনার সন্ধানে সমস্ত অঞ্চল চয়ে ফেলেছি। মাইকে ঘোষণা দিব কি-না চিন্তায় আছি আর আপনি এইখানে বসা। বটগাছ হলো সাপের আড্ডা। চলে আসেন। চলে আসেন।

তরিকুল ইসলাম উদ্বিগ্ন গলার স্বর বের করলেন। মিসির আলি বললেন, শীতকালে সাপ থাকে না। সব হাইবারনেশানে চলে যায়। শীত নিদ্রা।

তরিকুল ইসলাম বললেন, পুরানা নিয়ম-কানুন। এখন নাই। অনেক সাপ আছে শীতকালেও জেগে থাকে। আসেন তো ভাই। চিতল মাছ চলে এসেছে। আপনাকে না দেখায়ে কাটতেও পারছি না। চিতল মাছ রাঁধতে সময় লাগে না। কিন্তু কাটাকুটি বিরাট হাঙ্গামা। বটগাছের গুড়িতে বসে করছিলেন কি?

দৃশ্য দেখছিলাম।

দৃশ্য দেখার কি আছে। এখানে। কিছুই নাই। আধমরা এক নদী। নদীর পাড় ঘেঁষে যে হাঁটবেন। সেই উপায় নাই। সবাই নদীর পাড়ে হাগে। গ্রামের মানুষদের এমনই মেন্টালিটি- বাড়িতে সেনিটারি পায়খানা করে দিলেও হাগতে আসবে নদীর পাড়ে।

মিসির আলি বললেন, এই প্রসঙ্গটা থাক। আসুন অন্য কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করি।

কি প্রসঙ্গ?

আপনার জামাইকে নিয়ে কথা বলুন! বাড়িতে যেতে যেতে আপনার জামাইয়ের কথা শুনি। সে কেমন ছেলে?

ভালো। শুধু ভালো বললে কম বলা হবে অত্যাধিক ভালো। আয়নার সঙ্গে তার বনিব্যুনা হয় নাই। তারপরেও সে সব সময় আমার খোঁজ খবর করে। গত ঈদে আমাকে সিল্কের পাঞ্জাবি দিয়েছে। তার শাশুড়ির জন্যে লাল পেড়ে কাতান শাড়ি।

ভালো তো।

আমের সিজনে দুই ঝুড়ি আমি আনবেই। রাজশাহীর আমি। এক ঝড়ি খিরসাপাতি আরেক ঝুড়ি ল্যাংড়া।

আয়নার সঙ্গে বনিবিনা হলো না কেন?

ছেলের কোনো দোষ নাই। মেয়েটির সমস্যা। মাথা খারাপ মেয়ে। কোনো কারণ ছাড়া দুই দিন তিন দিন দরজা বন্ধ করে বসে থাকে।

ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?

তরিকুল ইসলাম বললেন, ডাক্তার কবিরাজ কিছু করতে পারবে না রে ভাই। মূল বিষয় হচ্ছে-খারাপ বাতাস। জানি সায়েন্স এইসব স্বীকার করবে না। তারপরেও খারাপ বাতাস বলে একটা বিষয় আছে। এই বিষয়ে আপনার মতামত কি?

মিসির আলি কিছু বললেন না। তরিকুল ইসলাম বললেন, খারাপ বাতাস তৈরি করে খারাপ জ্বীন ভূত। তাবিজ কবচ দিয়ে জীন ভূত তাড়ানো যায়, কিন্তু খারাপ বাতাস তাড়ানো যায় না। এইটাই সমস্যা।

মিসির আলিকে আয়োজন করে মাছ দেখানো হলো। গজফিতা আনা হয়েছিল। গজফিতা দিয়ে মিসির আলিকেই সেই মাছ মাপতে হলো। তিন ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি। মিসির আলি মাছ মাপামাপি করছেন সেই দৃশ্যের ছবি তোলা হলো মোবাইল টেলিফোনে। একটা ছবি না, একাধিক ছবি।

মিসির আলি হতাশ বোধ করলেও যন্ত্রণা সহ্য করে গেলেন। মোবাইল ফোনের সঙ্গে ক্যামেরা যুক্ত হয়ে বিরাট সমস্যা হয়েছে। সবাই ফটোগ্রাফার। বাংলাদেশে মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা এক কোটি। এর অর্থ এক কোটি ফটোগ্রাফার ক্যামেরা হতে ঘুরছে।

তরিকুল ইসলাম বললেন, ভাই সাহেব! আমার ধারণা পাঁচ দশ বছরের মধ্যে এমন ক্যামেরা বার হবে যা দিয়ে ভূত প্রেতের ছবি তোলা যাবে। যারা এইসব বিশ্বাস করে না, তাদের গালে পড়বে থাপ্পড়। ঠিক বলেছি কি-না বলুন।

মিসির আলি বললেন, সে রকম ক্যামেরা আবিষ্কার হলে অবিশ্বাসীরা বড় ধরনের ধাক্কা অবশ্যই খাবে।

আপনি কি অবিশ্বাসী?

জি।

তরিকুল ইসলাম বললেন, আচ্ছা যান আমি আপনাকে ভূত দেখাব। কথা দিলাম।

ভূত দেখাবেন?

অবশ্যই দেখাব। আমার লাগবে বড় সাইজের গজার মাছ। সেই মাছ আগুনে পুড়ে জঙ্গলে ভোগ দিতে হবে। সব ধরনের ভূত প্রেতের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে গজার মাছ। খড়ের আগুনে আধাপুড়া গজার মাছ। আর পেতন্ত্রীগুলির প্রিয় খাদ্য ইলিশ মাছ ভাজি। আপনি আগামী শনিবার পর্যন্ত থাকুন আমি প্রেত দেখায়ে দিব। শনি-মঙ্গলবার ছাড়া এদের দেখা পাওয়া কঠিন।

মিসির আলি ভোজন রসিক মানুষ না, কিন্তু চিতল মাছের পেটি আগ্রহ করে খেলেন। পোলাওয়ের চালের সুগন্ধি ভাত। প্রচুর ধনে পাতা দেয়া মাছের পেটি। বাটি ভর্তি চিতল মাছের গাদা দিয়ে বানানো কোপ্তা। পেটি খাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা করে কোপ্তা মুখে দিয়ে চিবুতে হয়। খাবার তদারকি করছেন হেডমাস্টার সাহেবের স্ত্রী। আয়নাকে আশেপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মিসির আলি বললেন, আয়না কোথায়?

হেডমাস্টার বললেন, মাছ রান্না হচ্ছে তো-ও দোতলা থেকে নামবে না। মাছের গন্ধ সহ্য করতে পারে না

মিসির আলি বললেন, আমাদের নবীজিও (স.) মাছের গন্ধ সহ্য করতে পারতেন না। তিনি কখনো মাছ খান নি। একবার ইয়েমেনে তাকে মাছ খেতে দেয়া হয়েছিল। দুর্গন্ধ বলে তিনি সরিয়ে রেখেছিলেন।

হেডমাস্টার বললেন, জানতাম নাতো।

এই জ্ঞান হেডমাস্টার সাহেবকে তেমন অভিভূত করতে পারল না। তিনি শুরু করলেন ভূতের গল্প।

বুঝলেন ভাই সাহেব! আমি নিজের চোখে ভূত দেখেছি। দুই বছর আগে। চৈত্র মাসে।। ঘটনাটা বলব?

বলুন শুনি।

আপনি যে ঘরে ঘুমান, সেই ঘরে আমি এবং আমার স্ত্রী শুয়েছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘর অন্ধকার, কিন্তু ক্যারাম খেলার আওয়াজ আসছে।

ক্যারাম?

জ্বি ক্যারাম। বড় একটা ক্যারামবোর্ড কিনেছিলাম। আমার স্ত্রী ক্যারাম খেলতে পছন্দ করেন, তার জন্যেই কেনা। সেই ক্যারামে কেউ ক্যারাম খেলছে। ঘটাস ঘটাস শব্দে স্ট্রাইকার মারছে। গুটি গর্তে পড়ছে। আমি টর্চ ফেলে দেখি ক্যারামবোর্ড মেঝেতে বিছানো। গুটি বোর্ডে ছড়ানো। ঘরে কেউ নেই। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

একদিনই শুনেছেন। আর শুনেন নি?

জ্বি না। ঐ ঘরে থাকাই ছেড়ে দিলাম।

মিসির আলি বললেন, ক্যারাম বোর্ডটা কি আছে? না সেটাও ফেলে দিয়েছেন।

ক্যারামবোর্ড আছে। ক্যারামবোর্ড ফেলব। কেন? আপনার ঘরেই আছে। রাতে ঘুম ভাঙলে একটু খেয়াল রাখবেন। ক্যারাম খেলার শব্দ শুনলেও শুনতে পারেন। তবে ভয় পাবেন না। যে সব ভূত প্রেত মানুষের বাড়িতে থাকতে আসে তারা সাধারণত নিরীহ হয়। এদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অবশ্য প্রটেকশান নেয়া আছে আপনার তোষকের নিচে মোজা ভর্তি সরিষা আর দুটা রসুন রাখা আছে। সরিষা এবং রসুন যেখানে থাকে। সেখানে ভূত জ ব।।

কারণ কি?

রসুন আর সরিষার ঝাঁঝ তারা সহ্য করতে পারে না। ভূত প্রেতের স্মেল সেন্স খুবই ডেভেলপড। রাতে কি খাবেন বলেন।

রাতে কিছু খাব না-রে ভাই।

অসম্ভব কথা বললেন। রাতে খাবেন না মানে? রাজহাঁস কখনো খেয়েছেন? রাজহাঁস খাওয়াই।

এত সুন্দর একটা প্রাণী। তাকে কেটে কুটে খেয়ে ফেলব? আমি এর মধ্যে নাই। হেডমাস্টার বিরক্ত গলায় বললেন, আপনিতো ছাতু খাওয়া হিন্দু সাধুর মত কথা বলছেন। আপনি হিন্দু সাধু না। আপনি গরু খাওয়া মুসলমান। রাজহাঁস খেতেই হবে।

মিসির আলি হতাশ গলায় বললেন, ঠিক আছে রাজহাঁস খাব।

মিসির আলিকে রক্ষা করল তাঁর দুর্বল পাকস্থলী। চিতল মাছের পেটি দুর্বল স্টমাক সহ্য করল না। সন্ধ্যার দিকে কয়েকবার বমি করে তিনি নেতিয়ে পড়লেন। রাজহাঁস না খেয়েই রাতে ঘুমুতে গেলেন। তাকে কিছু খেতে হবে। না। এই আনন্দেই তিনি অভিভূত। আধশোয়া হয়ে লেপ গায়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে। কদম ফুলের হালকা সুবাস নাকে আসছে। তিনি ঠিক করলেন, শীতকালে ফুল ফুটে এমন কদমের চারার খোজ করবেন। ঢাকায় যে বাড়িতে থাকেন তার সামনে ফাঁকা জায়গা আছে। কদমের চারা সেখানে পুতে দেবেন।

মাজেদ নামের নয় দশ বছরের একটা ছেলেকে দেয়া হয়েছে গা, হাতপা টিপে তাকে আরাম দেবার জন্যে। মিসির আলি তাকে সে সুযোগ দেন। নি। একটা মানুষ তার গা ছানাছানি করবে। এই চিন্তাই তাঁর কাছে অরুচিকর।

মনে হচ্ছে মাজেদিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার ঘরে কম্বল পেতে ঘুমানোর জন্যে। সে খাটের দক্ষিণ দিকে মহানন্দে বিছানা করছে।

মিসির আলি বললেন, মাজেদ! তুমি স্কুলে যাও?

জ্বে না স্যার।

যাও না কেন?

মাস্টার ভাল না। পিটন দেয়।

লেখাপড়া শিখতে ইচ্ছা করে না?

জ্বে না।

বড় হয়ে কি করবে? ক্ষেতের কাজ?

খলিফার কাজ শিখবা। সদরে দোকান দিব।

তোমার বংশে খলিফা আছে?

আমার বড় মামা খলিফা। নাম সবুর মিয়া। সবেই ড়াকে সবুর খলিফা।

আমার ঘরে তোমাকে না ঘুমালেও চলবে। আমার শরীর সেরে গেছে।

আমারে আপনের লগে ঘুমাতে বলছে। না ঘুমাইলে পিটন দিবে।

কে পিটন দিবে?

হেড স্যার।

তাহলে ঘুমাও। খাওয়া দাওয়া হয়েছে?

জ্বে। রাজহাঁসের সালুন দিয়া খাইছি।

রাজহাঁসের সালুন শুনে পেটে আয়েক দফা মোচড় দিচ্ছিল। মিসির আলি সেটা সামলালেন। মাজেদের নাক ডাকার অ্যাওয়াজ পাওয়া যাচেছ। বালিশে মাথা ছোয়ানো মাত্র ঘুমিয়ে পড়ার সৌভাগ্য তারা নেই। তাকে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে হবে। বইপত্র তেমন নিয়ে আসেননি। নিশি যাপন কঠিন হবে।

মিসির আলি ছাত্রের লেখা ডায়েরি হাতে নিলেন। আয়না মেয়েটির বিষয়ে আরো কিছু জানা যাক। আজ সারা দিনে একবারও তার সঙ্গে দেখা হয়নি। মাছের আশিটে গন্ধে কাতর এই মেয়ে কি শুয়ে পড়েছে? না কি সেও নিশি যাপন করছে? মিসির আলি ডায়েরি খুললেন।

আয়নাকে তার বাবা-মা'র কাছে রেখে আমি চলে এলাম। টিচার্সদের মেসে থাকি। ক্লাস নেই। প্রাইভেট টিউশনি করি। কোন কিছুতেই মন বসে না। আমি আয়নাকে একটা মোবাইল টেলিফোন কিনে দিয়েছিলাম। টেলিফোন সে ব্যবহার করে না। আমি যতবার টেলিফোন করি, তার সেন্ট বন্ধ পাই। আয়নাকে প্রতি সপ্তায় একটা করে চিঠি দেই, সে চিঠিরও জবাব দেয় না।

এক মাসের মাথায় আমি কোয়াটার পেয়ে গেলাম। তিনি কামরার ঘর। বারান্দা আছে। দক্ষিণমুখী জানালা। প্রচুর বাতাস। আয়নাকে এখন নিজের কাছে এনে রাখার আর বাধা নেই।

ঘর সাজানোর কিছু আসবাবপত্র কিনলাম। খাট, ড্রেসিং টেবিল, আলনা। হাঁড়ি-পাতিল কিনিলাম না, আয়নাকে সঙ্গে নিয়ে কিনিব। ঘর সাজানোর জিনিসপত্র কিনতে মেয়েরা সব সময় আনন্দ পায়। তবে আয়না আর দশটা মেয়ের মত না। সে আলাদা এবং প্রবল ভাবেই আলাদা। সে কি আগ্রহ নিয়ে হাঁড়িকুড়ি কিনতে যাবে?

এক রাতের ঘটনা। আমি রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়ে এসে ঘুমানোর আয়োজন করছি। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। কারেন্ট চলে গেছে। ঘর অন্ধকার। মোমবাতি জ্বলিয়েছি। বাতাসে মোমবাতি নিভু নিভু করছে। আমি দরজা জানালা বন্ধ করে বাতাস আটকালাম, আর তখন মোবাইল টেলিফোন বেজে উঠল।

হ্যালো কে?

আমি আয়না।

কেমন আছ আয়না?

ভাল না।

ভাল না কেন?

জানি না।

আমি তোমাকে অনেকগুলি চিঠি পাঠিয়েছি। তুমি পেয়েছ?

হ্যাঁ।

পড়েছ?

না।

পড়নি কেন?

ভাল লাগে না।

ভাল না লাগলে পড়ার দরকার নেই। এই শোন, আমি কোয়ার্টার পেয়েছি। ছিমছাম সুন্দর বাসা। বড় বারান্দা। দক্ষিণ দিকে বারান্দাতো প্রচুর বাতাস।

তোমার ঘরে কি আয়না আছে?

অবশ্যই আছে। আয়না থাকবে না কেন?

কয়টা আয়না?

তোমার জন্যে একটা ড্রেসিং টেবিল কিনেছি। সেখানে আয়না আছে। বাথরুমে আয়না আছে। আরেকটা যেন কোথায় আছে। ও আচ্ছা, বেসিনের সঙ্গে।

তুমি একটা আয়নার সামনে দাঁড়াওতো।

কেন?

আছে একটা ব্যাপার। আয়নার সামনে দাঁড়াও।

এই বলেই আয়না টেলিফোনের লাইন কেটে দিল।

আমি চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারলাম না। সে মোবাইল সেট বন্ধ করে দিয়েছে। আমি ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। চমকে দেখি আয়নায় আমার স্ত্রীকে দেখা যাচ্ছে। তার পরনে শাড়ি। ঘোমটা দেয়া। মুখ হাসি হাসি। সে এখন আছে অতি রূপবতী রূপে। তার আশেপাশে কিছুই নেই।

প্রথমে ভাবলাম বিকট চিৎকার দেই। সেই ভাবনা স্থায়ী হল না। বিকট চিৎকার কেন দেব? অয়নায় যাকে দেখা যাচ্ছে সে আমার স্ত্রী। কেন এ রকম দেখছি তার কোনো ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। আমার কাছে না থাকলেও ব্যাখ্যা থাকতে হবে।

আমার শিক্ষক মিসির আলি সব সময় বলতেন- সব মানুষই জীবনের কোনও না কোন সময় অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। তখন সে যুক্তির সিঁড়ি থেকে সরে দাঁড়ায়। নিজেকে সমর্পণ করে। রহস্যময়তার কাছে। এই কাজটি কখনো করা যাবে না। আমাদের এগুতে হবে যুক্তির কঠিন পথে। মনে রাখতে হবে প্রকৃতি দাঁড়িয়ে আছে যুক্তির উপর। যুক্তি নেই তো প্রকৃতিও নেই।

মিসির আলি স্যার আমার কাছে অতিমানব। তার কথা অবশ্যই অভ্রান্ত। কিন্তু আমি আয়নায় কি দেখছি?

আমি আয়নার ভেতরে আয়না মেয়েটিকে বললাম, তুমি এখানে কি করছ?

আয়না হাসল। মাথা সামান্য কাত করল। আমি বললাম, আমি তোমার ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাকে একটু বুঝাও।

আয়না না সূচক মাথা নাড়ল।

তুমি আমাকে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলেছি। এটা তুমি করতে পার। You must speak out.

আয়না কথা বলা শুরু করল। সমস্যা একটাই। আমি তার কোনো কথা শুনতে পাচ্ছি না। তার ঠোঁট নড়ছে। কিন্তু আমি কিছু শুনছি না। ভয়াবহ অবস্থা। আমি মোমবাতি হাতে বাথরুমে আয়নার কাছে গেলাম। সেই আয়নার ভেতরেও আমার স্ত্রী বসে আছে। কথা বলছে কিন্তু আমি কিছুই শুনছি না।

মিসির আলিকে ডায়েরি পড়া বন্ধ রাখতে হল। কারণ ঘরের ভেতর খটাস খটাস শব্দ হচ্ছে। কে যেন ক্যারাম খেলছে। মাজেদের নাক ডাকার আওয়াজ আসছে। সে খেলছে না এটা বুঝা যায়। তাহলে কে? মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কদম ফুলের গন্ধ না। কড়া গন্ধ।

মিসির আলি ইচ্ছা করলেই উঁচু হয়ে খাটের ওপাশে কি হচ্ছে তা দেখতে পারেন। তিনি তা করলেন না। ডায়েরি বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন। খটাস খটাস শব্দ হতেই থাকল। মিসির আলি চোখ বন্ধ করলেন। খটাস খটাস শব্দ থেমে গেল। কড়া মিষ্টি গন্ধটাও আর পাওয়া যাচ্ছে না। মিসির আলি ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর তৃপ্তির ঘুম হল।

৩. মিসির আলি বারান্দায় বসে আছেন

সকাল আটটা।

মিসির আলি বারান্দায় বসে আছেন। তাঁর পায়ের কাছে মাজেদ। ঘুম ভাঙার পর থেকেই সে মিসির আলির সেবা করার নানান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কোনো লাভ হচ্ছে না। মিসির আলি সেবা গ্রহণ করতে রাজি হচ্ছেন। না! মাজেদ হাল ছাড়ার পাত্র না। সে চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে।

পায়ে তেল দিয়া দিমু স্যার?

না।

শীতকালে পায়ে তেল দিতে হয়। তেল না দিলে চামড়া ফাটে।

ফাটুক।

মাথা মালিশ করব? আরাম পাইবেন।

আমার আরামের দরকার নেই।

সবের আরাম দরকার। নেড়ি কুত্তারও আরাম দরকার।

তাই নাকি?

জে। দেহেন না রইদ উঠলে কুত্তা কেমন রইদ তাপায়।

তা ঠিক।

গরুরাও আরাম দরকার। গরুর গলাতে যদি আপনে হাতাহাতি করেন আরামে তার চউখ বন্ধ হয়। মাথা টিপ্যা। আমি আপনেরে এমন আরাম দিব যে আপনের চউখ বন্ধ হয়ে যাবে।

মিসির আলি বললেন, আমি চোখ খোলা রাখতে চাই। বই পড়ছিতো। চোখ বন্ধ রাখলেতো বই পড়তে পারব না। তাছাড়া আমি গরু না, মানুষ।

মাজেদ বলল, কি বই পড়েন?

কবিতার বই পড়ি। দিনের শুরুটা কবিতায় করা ভাল।

কবিতার মধ্যে কি লেখা স্যার?

শুনতে ইচ্ছা করে?

জ্বে।

মিসির আলি আবৃত্তি করলেন—

Two Toads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth,

মাজেদ হা করে কবিতা শুনছে। তার চোখ ভর্তি বিস্ময়। মিসির আলি বললেন, কবিতা কেমন শুনলি? ভাল লেগেছে?

জ্বে স্যার। ভাল। আরো শুনবি?

জ্বে শুনব। মাজেদকে কবিতা শুনানো হল না। চা নিয়ে আয়না আসছে। আয়নাকে দেখেই মাজেদ উঠে দাঁড়াল, ভীত গলায় বলল, আমি যাই স্যার পরে আসব। মিসির আলির মনে হল যে কোনো কারণেই হোক মাজেদ আয়না মেয়েটাকে ভয় পায়।

আয়না বলল, চা নিয়ে এসেছি।

মিসির আলি বললেন, থ্যাংক য়ু।

আয়না বলল, আপনার নাশতা রেডি হচ্ছে। খাটি ঘিয়ে ভাজা চপচপে পরোটা এবং রাজহাঁসের ভুনা মাংস। এত চেষ্টা করেও রাজহাঁসের হাত থেকে রক্ষা পেলেন না।

মিসির আলি বললেন, তাইতে দেখছি।

আয়না বলল, স্যার আপনার সামনে বসি।

মিসির আলি বললেন, আরাম করে বাস। এবং কি বলতে চাও বলে ফেল।

আয়না বসতে বসতে বলল, আপনার মানসিক ক্ষমতা দেখে অবাক হয়েছি।

মিসির আলি বললেন, কোন ক্ষমতাটা দেখলে?

আয়না বলল, রাতে ক্যারাম খেলার খটাস খটাস ভৌতিক শব্দ হচ্ছে। আপনি নির্বিকার, মাথা উঁচিয়ে দেখার চেষ্টাও করলেন না। ঘুমিয়ে পড়লেন। আপনি ছাড়া অন্য যে কোনো মানুষ ভয়ে অস্থির হত। ডাকাডাকি শুরু করত। আপনি একটুও ভয় পাননি, এর কারণ কি স্যার?

মিসির আলি বললেন, বেশির ভাগ মানুষ সংশয়বাদী। তাদের ধারণা ভূত-প্রেত থাকলে থাকতেও পারে। আমার মধ্যে এই ধরনের কোনো সংশয় নেই।

ক্যারাম খেলার শব্দ কি ভাবে হল?

মিসির আলি বললেন, শব্দটা পাশের ঘরে হয়েছে। কেউ একজন খটাস খটাস শব্দে ক্যারাম খেলেছে।

সেই কেউ টা কে? আমি?

না তুমি না। তোমার বাবা।

কিভাবে বুঝলেন?

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, তোমার বাবা আমাকে আস্তিক বানানোর চেষ্টা করছেন। পাশের ঘরে খটাস খটাস শব্দ করে আমাকে ভূতের ভয় দেখাতে চাচ্ছেন।

বাবা এই কাজটা করেছেন। আপনি এত নিশ্চিত হচ্ছেন কি ভাবে?

মিসির আলি বললেন, সকালে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তিনি জানতে চাইলেন, রাতে ঘুম ভাল হয়েছে কি না। তার গলায় ছিল কৌতূহল এবং অগ্রহ।

আয়না বলল, এই থেকে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায় না। আপনি অসুস্থ ছিলেন। অতিথি মানুষ। আপনার ভাল ঘুম হয়েছে কি না সেটা কৌতূহল এবং আগ্রহ নিয়ে জানতে চাওয়াটাতো স্বাভাবিক।

মিসির আলি বললেন, যখন ক্যারাম খেলার শব্দ হচ্ছে তখন আমি মিষ্টি গন্ধ পেলাম। আমি চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ার পর খটাস খটাস শব্দ থেমে গেল। মিষ্টি গন্ধও পাওয়া গেল না। মিষ্টি গন্ধটা জর্দার। তোমার বাবা প্রচুর জর্দা দিয়ে পান খান। এখন কি তুমি আমার Deduction গ্রহণ করবে?

জ্বি স্যার করব।

মিসির আলি বললেন, বিডি ল্যাংগুয়েজের একটা ব্যাপার আছে সেটা কি জান?

না।

আমরা মুখে অনেক কথা বলি না, কিন্তু আমাদের শরীর বলে। মনের ভেতরের কথা শরীর প্রকাশ করে দেয়। সকালবেলা তোমার বাবার বডি ল্যাংগুয়েজ তাকে প্রকাশ করে দিয়েছে। উদাহরণ দিয়ে বুঝাব?

বুঝান।

তুমি আমার সামনের চেয়ারে বসেছি। পায়ের উপর পা তুলে বসেছি। পা কিন্তু আমার দিকে না। যেদিক থেকে এসেছি সেদিকে রাখা এর অর্থ তুমি আমার সামনে বসে থাকতে চাচ্ছ না, চলে যেতে চাচ্ছ।

আয়না অবাক হল। ভালই অবাক হল।

মিসির আলি বললেন, তুমি এখন তোমার বসার অবস্থা একটু বদলেছ। মাথা সামান্য নিচু করে উপরের দিকে তাকাচ্ছ। মাথা নিচু করে যখন কোনো মেয়ে উপরের দিকে তাকায়, তখন তার চোখ বড় দেখা যায় এবং তার মধ্যে সামান্য হলেও খুকি ভাব আসে। তুমি এই ভাবটা নিয়ে এসে আমাকে বলার চেষ্টা করছি যে আমি যা বলছি তা সত্যি। আরো উদাহরণ

দিন।

তোমার বাবা যখন সিগারেট খান তখন উপরের দিকে ধোঁয়া ছাড়েন। তুমি যখন সামনে থা্কে তখন মেঝের দিকে ধোঁয়া ছাড়েন। এর অর্থ তুমি সামনে থাকলে তাঁর

Confidence level নেমে যায়। আমাদের মন অনেক কিছু বলতে চায় না। কিন্তু শরীর বলে দেয়।

আয়না বলল, আপনি বুদ্ধিমান।

মিসির আলি বললেন, আমার বুদ্ধি আর দশজন মানুষের মতই। আমার সুবিধা হচ্ছে। আমি বুদ্ধি ব্যবহার করি। অন্যরা করে না, বা করতে চায় না।

আয়না বলল, আপনি কি আপনার ছাত্রের লেখা ডায়েরিটা পড়ে শেষ করেছেন?

দশ পৃষ্ঠার মত পড়েছি। Slow reader, কারণ কি জান? কারণ হচ্ছে লেখা থেকে আমি ধরার চেষ্টা করি লেখার বাইরের কি লেখা আছে তা। লেখার মধ্যেও বডি ল্যাংগুয়েজ আছে।

আয়না বলল, যে দশ পৃষ্ঠা পড়েছেন সেখানে লেখার বাইরে কি লেখা আছে?

মিসির আলি বললেন, লেখার বাইরে লেখা আছে যে স্বামী স্ত্রী হিসেবে বাস করেছ কিন্তু তোমাদের ভেতর শারীরিক কোনো সম্পর্ক হয়নি! কি ভাবে ধরলাম বলব?

না। চলুন নাশতা খেতে যাই।

নাশতার টেবিলে হেডমাস্টার সাহেব একটি আনন্দ সংবাদ দিলেন। রাজ্য জয় করে ফেলেছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন, ভাই সাহেব গুড নিউজ। গজার মাছ পাওয়া গেছে। ইনশাল্লাহ আজ রাতে আপনাকে ভূত দেখাতে পারব।

মিসির আলি হাসলেন। হেডমাস্টার বললেন, আপনার অবিশ্বাস আজ পুরোপুরি দূর হবে।

মিসির আলি বললেন, অবিশ্বাসী মানুষের সবচে বড় সমস্যা হল একটা অবিশ্বাস দূর হলে অন্য অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়।

আজ সব ভেঙেচুড়ে দেব। খড়ের আগুনে সামান্য লবণ দিয়ে গজার মাছ পুড়া হবে।

মিসির আলি বললেন, সেই মাছ কি আমরা জঙ্গলে রেখে আসব?

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, না। মাছ ঘরে রেখে দেব। তারপর দেখবেন কি হয়।

কি হবার সম্ভাবনা?

পোড়া মাছের লোভে ভূত প্রেতি বাড়ির চারপাশে ঘোরাঘুরি শুরু করবে।

আয়না বলল, বাবা ভূতের আলাপ থাকুক। দিনের বেলা ভূতের ইতিহাস শুনতে ভাল লাগে না। সন্ধ্যা হোক তারপর শুরু করা। নাশতা খাবার পর আমি স্যারকে নিয়ে বেড়াতে বের হব। তুমি কি যাবে আমাদের সঙ্গে?

আরো পাগল হয়েছিস? গজার মাছ পুড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে না? মাছ পুড়ানোর টেকনিক আছে। আগুনে ফেলে দিলেই হয় না।

আয়না মিসির আলিকে নিয়ে বটগাছের কাছে এল। সে কাঁধে ঝুলিয়ে পাটের ব্যাগ এনেছে। সেখান থেকে ক্যামেরা বের করে বলল, বটগাছের ছবি তুলতে চেয়েছিলেন। ছবি তুলুন।

মিসির আলি হাতে ক্যামেরা নিলেন। একবারও জানতে চাইলেন না তিনি যে ছবি তুলতে চেয়েছেন সেটা আয়না জানল কি ভাবে।

মাছরাঙার ছবি তুলুন।

মিসির আলি মাছরাঙার ছবি তুলে বললেন, তোমার একটা ছবি কি তুলে দেব?

আয়না না সূচক মাথা নাড়ল। মিসির আলি বললেন, তুমি এখন মুখের ভাষায় না বলনি। শরীরের ভাষায় মাথা নেড়ে না বলেছ। শরীরের এই ভাষাটা আমরা সবাই জানি। এই ভাষার উৎপত্তি কি ভাবে জান?

জানি না।

জানতে চাও?

চাই।

মিসির আলি বললেন, না বলার এই শারীরিক ভাষা তৈরি হয়েছে আমাদের শৈশবে। একটা শিশুকে মা খাওয়াচ্ছে। সে কথা বলা শিখেনি। তার পেট ভর্তি হয়ে গেছে সে এবার খাবে না। তখন তার মুখের কাছে খাবার নিলে সে মুখ সরিয়ে নেবে।। যেখানে মুখ সরিয়েছে সেখানে খাবার নিলে মুখ আরেক দিকে সরাবে। না সূচক মাথা নাড়ানাড়ি চলতেই থাকবে। বুঝতে পারছ?

আমি যে তোমাকে ইচ্ছা করে অবাক করতে চাচ্ছি সেটা বুঝতে পারছ?

পারছি।

কেন তোমাকে অবাক করতে চাচ্ছি সেটা বুঝতে পারিছ?

বুঝতে পারছি না। এবং বুঝতে চাচ্ছিও না। স্যার আপনি আর কতদিন থাকবেন?

পরশু চলে যাব।

যে মিশন নিয়ে এসেছিলেন সেটা কমপ্লিট হয়েছে?

মোটামুটি হয়েছে।

আয়না মেয়েটির রহস্য ধরে ফেলেছেন?

অনেকখানি ধরেছি। তুমি নিজে তোমার সম্পর্কে যা লিখেছি তা যদি পড়তে দাও। তাহলে পুরোটাই বুঝতে পারব। দিবে?

আয়না স্পষ্ট গলায় বলল, না।

মিসির আলি বললেন, চল বসি।

আয়না। ক্লান্ত গলায় বলল, চলুন।

দু'জন চুপচাপ বসা। মিসির আলি নদীর দিকে তাকিয়ে আছেন।

আয়না দুঃখী দুঃখী ভঙ্গিতে মিসির আলির দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। মিসির আলি বললেন, চুপচাপ বসে না থেকে গল্প কর।

আয়না বলল, আপনি গল্প করুন। আমি শুনি।

কি গল্প শুনতে চাও?

আয়না বলল, আপনার ছাত্রের কাছে শুনেছি আপনার একটা ফাইল আছে, সেখানে যে সব রহস্যের আপনি কোনো মীমাংসা করতে পারেন নি। সেই সব অমীমাংসিত রহস্যের কথা লেখা।

ঠিকই শুনেছ।

সে সব গল্পের একটা শুনান। আপনার ব্যর্থতার গল্প শুনি। না কি আপনার আপত্তি আছে?

কোনো আপত্তি নেই। বরং আগ্রহ আছে। আমি রহস্যভেদ করতে পারি নি, অন্য একজন পারবে। সেই অন্য একজন তুমিও হতে পার।

গল্প শুরু করুন।

মিসির আলি শুরু করলেন—

বছর পনেরো আগের কথা। আমার কাছে একটা কিশোরী মেয়ে এসেছে। চৌদ্দ পনেরো বছর বয়স। সে এক আসেনি, তার মা তাকে নিয়ে এসেছে। মেয়েটার নাম নোশিন। তার নাকি ভয়ংকর এক সমস্যা। আমি তার সমস্যার সমাধান দেব এই মা মেয়ে দু'জনের আশা।

আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি। আমার নিজের একটা ছোট্ট কামরা আছে। ক্লাসের শেষে সেখানে বসে পড়াশোনা করি। মেয়ে এবং মেয়ের মা সেখানেই বসেছে। আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, কি সমস্যা গো মা?

মেয়ে ভীত চোখে মা'র দিকে তাকাল। সে তার সমস্যা নিজের মুখে বলতে চায় না। মাকে দিয়ে বলতে চায়। তার মা বললেন, নোশিন কি যেন দেখে।

আমি বললাম, কি দেখ?

নোশিন আবার তার মা'র দিকে তাকালো।

আমি বললাম, তোমার সমস্যা তোমাকেই বলতে হবে। খোলাখুলি বলতে হবে এবং আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলতে হবে। কোন ক্লাসে পড়?

ক্লাস টেন।

তুমি পড়াশোনায় কেমন?

ভাল।

সায়েন্স গ্রুপ?

জ্বি।

এইত কথা বলতে পারছি। এখন সমস্যা বলা শুরু কর। কোক বা পেপসি খাবে আনিয়ে দেব?

না।

শোন নোশিন! তুমি পেপসি বা কোক খেতে চাচ্ছ। তোমার বডি ল্যাংগুয়েজ তাই বলছে। কিন্তু মুখে বলছ না। আমি আনিয়ে দিচ্ছি। কি আনতে বলব কোক?

সেভেন আপ।

আমি সেভেন আপ আনতে বেয়ারাকে পাঠালাম। নোশিন অনেকখানি সহজ হল। সে হাত মুঠি করে বসেছিল। হাতের মুঠি সামান্য আলগা করল। কেউ যখন কিছু বলতে চায় না, তখন হাত মুঠিবদ্ধ করে রাখে।

সেভেন আপের গ্লাসে চুমুক দিয়ে নোশিন তার সমস্যাটা বলল, সে না কি খুব ছোটবেলা থেকেই জন্তুর মত একটা কিছু দেখে। জন্তুটা থাকে মানুষের পেছনে। সব মানুষের পেছনে না। যারা অল্পদিনের মধ্যে মারা যাবে। তাদের পেছনে। জন্তুটা দেখতে কিছুটা মানুষের মত। তবে মুখ গরুর মুখের মত লম্বা। তাদের চোখও গরুর চোখের মত। সেই চোখের মণি কখনো স্থির না। সব সময় ঘুরছে। জন্তুর গা থেকে কাঠপোড়ার গন্ধ আসে। তার হাত পা মানুষের মত। শুধু হাতের আঙুল অস্বাভাবিক লম্বা।

নোশিনের মা বললেন, মেয়ে যা বলছে সবই সত্যি। আমাদের যে সব আত্মীয় স্বজন মারা গেছেন, তাদের প্রত্যেকের পেছনে সে এই জন্তু দেখে ভয়ে অস্থির হয়ে কান্নাকাটি করেছে। যাদের পেছনে সে এই জন্তু দেখেছে তারা প্রত্যেকেই সাত থেকে দশদিনের ভেতর মারা গেছে।

আমি বললাম, নোশিন জন্তুটার সাইজ কি? কত লম্বা?

নোশিন বলল, যার পেছনে সে দাঁড়ায় তারচেয়ে সে এক ফুটের মত লম্বা হয়। তার মাথার উপর দিয়ে জঞ্জটার মাথা দেখা যায়। জন্তুটা গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে থাকে।

জন্তুটার গায়ে কাপড় দেখেছ? সে দেখতে মানুষের মত? মানুষ জামা কাপড় পরে। জন্তুটা কি পরেছে?

নোশিন এই প্রশ্নের জবাব দিল না। চোখ নামিয়ে টেবিলের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি তাকে নিয়ে সেদিনই ঢাকা মেডিকেল কলেজে গেলাম। তাকে বললাম, তুমি আমাকে সাতজন রোগী দেখাও যাদের পেছনে ঐ জন্তু দাঁড়িয়ে আছে।

নোশিন দেখাল। আমি রোগীদের নাম ধাম লিখে চলে এলাম। নোশিনকে বললাম, পরে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

আশ্চর্য হলেও সত্যি সাতজন রোগীই দশ দিনের মাথায় মারা গেল। নোশিনকে নিয়ে এই পরীক্ষা আরো দুইটা হাসপাতালে করলাম। তার একটি হচ্ছে আজমপুর সরকারি মেটার্নিটি ক্লিনিক। যেখানে অনেক সময় মা এবং নবজাতক দু'জনই মারা যায়। নোশিন তাও ঠিকঠাক মত বলতে পারল।

সে বলল যে সব রোগী বিছানায় শুয়ে থাকে জন্তুটা তার পাশে শুয়ে থাকে। বেশির ভাগ সময় গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকে। নবজাতক শিশুর সঙ্গে যে জন্তুটা শুয়ে থাকে, সেই জন্তুটার সাইজ শিশুর চেয়ে সামান্য বড়।

আমি একটি হাইপোথিসিস দাঁড়া করালাম। জটিল কিছু না। সহজ ব্যাখ্যা। মেয়েটি কোনো বিশেষ উপায়ে মানুষের মৃত্যু sense করতে পারে। হয়ত কোনো গন্ধ পায় বা এরকম কিছু। মৃত্যু সেন্স করার পর পরই তার ব্রেইন একটা কাল্পনিক ভয়ংকর জন্তুর মূর্তি তৈরি করে। তার ভেতর illusion তৈরি হয় যে সে জন্তু দেখছে।

পাশাপাশি আরেকটা হাইপোথিসিস দাঁড়া করলাম। এই হাইপোথিসিসে মেয়েটির ভবিষ্যত দেখার ক্ষমতা আছে। পুরো ভবিষ্যত না দশ বারোদিনের ভবিষ্যত। এর মধ্যে যারা মারা যাবে সে জানে, তাদের পেছনেই জন্তু কল্পনা করে নেয়।

আমি প্রায় এক বছর এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলাম। প্যারানরম্যাল ভুবনে নোশিনের মত আর কোনো উদাহরণ আছে কিনা জানার চেষ্টা করলাম। অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাদের অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তখন ইন্টারনেট শুরু হয়নি। অনেক চিঠিপত্র চালাচালি করতে হল। বলিভিয়ার এক বৃদ্ধের খোঁজ পাওয়া গেল যে মানুষের মৃত্যুর দিন ক্ষণ বলতে পারে তবে সে কোনো জন্তু দেখে না। তার নাম সিমন ডি শান। যখন ভাবছি সরাসরি তার সঙ্গে যোগাযোগ করব হঠাৎ খবর পেলাম নোশিন তার নিজের পেছনে একটা জন্তু দেখছে।

মিসির আলি বললেন, আজ এই পর্যন্ত। বাকিটা অন্য সময় বলব।

আয়না বলল, অন্য সময় বলবেন মানে? এখনই গল্প শেষ করবেন। গল্প শেষ না করে উঠতে পারবেন না।

মিসির আলি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, কেন পারব না বল? তুমি সবার উপর প্রভাব খাটাচ্ছ। আমার উপরও প্রভাব ফেলতে চাচ্ছি। আমাকে এই চক্র থেকে বের হতে হবে। তুমি ফুটবল খেলতে এসে বল রাখছি নিজের পায়ে। তা আর হবে না। বল নিয়ে আসতে হবে। আমার নিজের কোর্টে।

আয়না বলল, গল্পের শেষটা খুব জানতে ইচ্ছা করছে।

কোনও এক সময় অবশ্যই জানবো।

সেটা কখন? আজ?

মিসির আলি বললেন, জানি না। তিনি বাড়ির দিকে রওনা হয়েছেন। আয়না আসছে না। সে তার জায়গাতেই বসে আছে। তাকিয়ে আছে মিসির আলির দিকে। তার চেহারা বিষণ্ণ। কেঁদে ফেলার আগে কোনো তরুণীকে যে রকম দেখায়, তাকে সে রকম দেখালো। মিসির আলির মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। তিনি বললেন, আয়না এসো। গল্পের শেষটা শুনে যাও। বাড়ির দিকে যেতে যেতে গল্পটা করি। আয়না প্রায় দৌড়ে এল। মিসির আলি ছোট ছোট স্টেপ নিয়ে এগুচ্ছেন, গল্প করছেন। আয়না। কান পেতে আছে।

বুঝতেই পারছি নোশিন মেয়েটির বাড়িতে কান্নার সীমা রইল না। তখনি তাকে ডাক্তারের কাছে নেয়া হল। যদি কোনো রোগ ধরা পড়ে তার চিকিৎসা যেন শুরু হয়।

পুরো মেডিকেল চেক আপ। নোশিনের বাধা নিজেও একজন ডাক্তার, পিজিতে কাজ করেন।

মেডিকেল চেকাপে খারাপ ধরনের জন্ডিস ধরা পড়ল। হেপাটাইটিস সি বা ডি এই ধরনের কিছু। সুস্থ সবল মেয়ে দেখতে দেখতে মরার মত হয়ে গেল। তাকে ভর্তি করা হল পিজি হাসপাতালে। মেডিকেল বোর্ড বসল। নোশিনের অবস্থা দ্রুত খারাপ হওয়া শুরু করল। বেশির ভাগ সময় সে চোখ বন্ধ করে থাকে। ঘরের আলো সহ্য করতে পারে না।

এক রাতে নোশিন তার মাকে বলল জন্তুটা তার সামনে চলে এসেছে। বসে আছে হাসপাতালের বিছানার পাশে। নোশিনকে অদ্ভুত ভাষায় কি সব বলে নোশিন বুঝতে পারে না।

আমি প্রতিদিনই নোশিনকে দেখতে যাই। তাকে সান্ত্বনা দেয়া বা প্রবোধ দেবার কিছু নেই। আমি যাই ব্যাপারটা বুঝতে। নোশিনকে নানান প্রশ্ন করি। সে প্রতিটা প্রশ্নেরই জবাব দেয়। জবাব দিয়ে কাঁদে।

নোশিনী! জন্তুটা এখন কোথায়?

আমার সামনে।

কি করছে?

আঙুল নেড়ে নেড়ে কি যেন বলছে।

তুমি হাত ইশারায় তাকে চলে যেতে বল।

নোশিন হাত ইশারায় চলে যেতে বলল। মুখেও বলল, তুমি চলে যাও। তুমি চলে যাও।

আমি বললাম, নোশিন এখন জন্তুটা কি করছে?

হাসছে।

জন্তুটা হাসতে পারে?

পারে।

অষ্টম দিনে নোশিনের মা আমাকে টেলিফোন করে আসতে বললেন। বিশেষ একটা ঘটনা না কি ঘটছে। আমি তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে উপস্থিত হলাম। নোশিন আধশোয়া হয়ে আছে। তার হাতে কি যেন আছে। সে দুই হাতে সেটা আড়াল করতে চাইছে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে সবুজ রঙের কি যেন দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কোনো গাছের কষ। আমি বললাম, কি ব্যাপার?

নোশিন জানালি জন্তুটা তাকে ঘন্টাখানিক আগে এটা দিয়েছে এবং খেতে বলেছে। বার বার ইশারা করছে মুখে দিতে। সে কি করবে বুঝতে পারছে না।

আমি বললাম, কখন দিয়ে গেল?

নোশিন বলল, কখন দিয়েছে আমি জানি না। ঘুমাচ্ছিলাম হঠাৎ জেগে দেখি জোলির মত এই জিনিসটা আমার হাতে। জন্তুটা বিছানার পাশে দাড়িয়ে। হাত দিয়ে ইশারা করে আমাকে খেতে বলছে। চাচা আমি কি খাব?

আমি কি বলব বুঝতে পারছি না। জন্তুর ব্যাপারটাই নিতে পারছি না। সে খাবার এনে দিচ্ছে এটা কি ভাবে নেব? বার বার মনে হচ্ছে হাসপাতালের কোনো নার্স বা অ্যাসিস্টেন্ট মেয়েটার হাতে এটা দিয়েছে। টুথপেস্ট হবার সম্ভাবনা। দেখতে সে রকমই।

নোশিন বলল, কেউ খেতে দিচ্ছে না। সবাই বলছে খেলেই আমি মরে যাব। জন্তুটা আমাকে তাড়াতাড়ি মরার জন্যে এটা এনে দিয়েছে!

আমি বললাম, তোমার মন যা চায়। তাই কর। কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিজেকেই নিতে হয়। তবে আমি তোমার জায়গায় হলে হয়তো খেয়ে ফেলতম।

নোশিন হঠাৎ জিনিসটা মুখে দিয়ে মুখ বিকৃত করে গিলে ফেলল। এবং চোখ বড় বড় করে বলল, জন্তুটা দরজা দিয়ে চলে যাচ্ছে।

নোশিনের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। সে অতি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে। তার বিয়ে হয়। একজন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। তার নিজের জর্ন্তুটাকে চলে যেতে দেখার পর জন্তু দেখার রোগটা তার পুরোপুরি সেরে যায়। এই হচ্ছে অমীমাংসিত রহস্যের গল্প।

আয়না বলল, সব রহস্যের মীমাংসা না হওয়াই ভাল। তাই বুঝি? জ্বি তাই। সব রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেলে পৃথিবী সাধারণ হয়ে যাবে। আমি চাই না। আপনি আমার রহস্যের মীমাংসা করেন।

তুমি নিজে কি তোমার রহস্যের মীমাংসা করেছ? যদি করে ফেল তাহলেই হবে।

পোড়া গজার মাছ ভূত প্রেতকে দিয়ে খাওয়ানো প্রকল্প বাতিল হয়ে গেল। ঘটনা এরকম- খড়ের গাদায় আগুন দিয়ে লবণ মাখানো গজার মাছ ঢুকানো হবে। প্রস্তুতি সম্পন্ন। আগুন দেয়া হয়েছে। খড় ভেজা বলে আগুন ঠিকমত জ্বলছে না। একজন গেছে কেরোসিন

আনতে। হেড মাস্টার সাহেব বললেন, কেরোসিন দিয়ে আগুন ধারালে চলবে না। মাছে কেরোসিনের গন্ধ থাকলে ভূত সেই মাছ খাবে না। অল্প আগুনেই মাছ পুড়ানো শুরু হোক। দু'জন মিলে মাছটাকে আগুনে রাখতে যাচ্ছে তখন বনের ভেতর থেকে ভয়াল দর্শন এক কুকুর বের হয়ে এল। লাঠি নিয়ে একজন কুকুরটাকে তাড়া করতে গেল। কুকুরটা তার পা কামড়ে ধরল। আর তখন কনের ভেতর থেকে আরো দুটা কুকুর বের হল। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল মাছের উপর।

কুকুরের তাড়া খেয়ে হেড মাস্টার সাহেব উল্টে পড়লেন। পা মাচকালেন। মাছ ধরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চারজনের ভেতর তিনজনই কুকুরের কামড় খেল। হেডমাস্টার সাহেব কোনক্রমে রক্ষা পেলেন।

রাত বাড়ার পর শুরু হল আরেক উপদ্রব্য। কুকুর তিনটা হেড মাস্টার সাহেবের বাড়ির চারদিকে চক্রাকারে ঘুরতে শুরু করল। মাঝে মাঝে তারা থামে। তখন তিনজনই এক সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে।

হেডমাস্টার সাহেব মিসির আলিকে বললেন, অবস্থা কিছু বুঝলেন?

মিসির আলি বললেন, না।

তিন কুকুর হচ্ছে ঐ জিনিস।

কি জিনিস?

খারাপ জিনিস। কুকুরের বেশ ধরে এসেছে।

ভূত-প্রেত?

অবশ্যই। এদের আচার আচরণ দেখে বুঝতে পারছেন না?

মিসির আলি বললেন, ভূত-প্রেত কুকুরের বেশ ধরে আসবে কেন?

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, ভয় দেখানোর জন্যে এসেছে।

ধরে আসা উচিত। যেমন ধরুন চিতাবাঘ।

এরা যে কুকুর না। অন্য কিছু তা আপনি বিশ্বাস করছেন না?

মিসির আলি বললেন, না। আপনার কাছে বন্দুক থাকলে আমি বলতাম। একটা কুকুর গুলি করে মারতে। তাহলে আপনি ভূত মারার দুর্লভ সম্মান পেতেন। ভাই আপনার কাছে কি বন্দুক আছে?

না বন্দুক নাই। বন্দুক থাকলেও আমি গুলি করতাম না। ভূত-প্রেতের সাথে বিবাদে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। এদের ক্ষেপিয়ে দিলে সমস্যা আছে। সমানে সমানে বিবাদ চলে। অসমানে বিবাদ চলে না।

ভূতদের ক্ষমতা কি আমাদের চেয়ে বেশি?

অবশ্যই বেশি। যারা অদৃশ্য তাদের ক্ষমতা বেশি তো হবেই। মানুষ চাঁদে যাওয়া নিয়ে কত হৈ চৈ করল। খোজ নিয়ে জানা যাবে ভূত-প্রেত মানুষের অনেক আগেই চাঁদ, মঙ্গল গ্রহ এই সব জায়গায় বসতি করেছে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে তাদের রকেট লাগে না।

কুকুর তিনটার কারণে মিসির আলি রাতের খাবারের হাত থেকে বেঁচে গেলেন। দোতলা থেকে কেউ নামতে সাহস পেল না। পরিবারের সবাই অভুক্ত থেকে গেল!

রাত অনেক হয়েছে। বারান্দায় বসে মিসির আলি কুকুরের কর্মকাণ্ড দেখছেন। আয়না এসে তার পাশে বসতে বসতে বলল, কুকুর তিনটা কি কাণ্ড করেছে দেখেছেন স্যার?
মিসির আলি বললেন, দেখছি।

আয়না বলল, এই বাড়ির চারপাশে তাদের ঘুরঘুর করার কি আছে? গজার মাছ পুড়ানোর আয়োজন। এ বাড়ি থেকে করা হয়েছে এই তথ্য কুকুরদের জানার কথা না। স্যার আপনি তো অনেক বিষয় জানেন- কুকুর বিষয়ে কি জানেন?

মিসির আলি বললেন, তেমন কিছু জানি না। আমার বিষয় মানুষের সাইকোলজি। কুকুরের সাইকোলজি না। তবে একটা বিষয় জানি-কুকুর মিষ্টির স্বাদ জানে না। জিহ্বায় যে টেস্টবাড মিষ্টির স্বাদ টের পায় সেই টেস্টবাড কুকুরের নেই। তাকে রসগোল্লা দিয়ে দেখ, সে খাবে না।

আয়না বলল, স্যার আপনিতো সব বিষয়ে একটা হাইপোথিসিস দাঁড়া করিয়ে ফেলেন। কুকুর তিনটা সম্পর্কে আপনার হাইপোথিসিস কি?

মিসির আলি বললেন, সহজ হাইপোথিসিস আছে। কুকুর মানুষের ভয় টের পায়। যে কুকুরকে ভয় পায় কুকুর তাকেই তাড়া করে। তোমার বাবা প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন। কুকুর তিনটা ভয় ধরে ধরেই এখানে এসেছে। তোমার বাবা যখন ঘুমিয়ে পড়বে ওরা চলে যাবে।

আয়না বলল, আপনার কি একবারও মনে হয়নি কুকুর তিনটার এখানে আসার পেছনে আমার ভূমিকা আছে? মানুষকে যে প্রভাবিত করতে পারে, সে তো কুকুরকেও করতে পারবে।

মিসির আলি বললেন, তোমার সঙ্গে এ বাড়িতে কুকুর আসার কোনো সম্পর্ক নেই। কুকুর তিনটার কারণে তোমাদের বাড়ির সব মানুষ না খেয়ে আছে। ঐই কাজটাতো তুমি হতে দেবে না। তুমি কুকুর এনে থাকলে তাদের বিদেয় করে দিতে। সেটা তুমি করেনি। তুমি নিজেও অভুক্ত।

আয়না বলল, স্যার রেলিং ধরে একটু দাঁড়ান। আমি এদের বিদায় করে দিচ্ছি। এরা একজন একজন করে উঠে চলে যাবে। আর ফেরত আসবে না।

মিসির আলি রেলিং ধরে দাঁড়ালেন। কুকুর তিনটা এক লাইনে হিজ মাস্টার্স ভয়েসের মত থাবা গেড়ে বসে আছে। একটা কুকুর হঠাৎ একটু নড়ে চড়ে উঠল। তারপরেই ছুটে চলে গেল। বাকি দুটা আগের মতই বাসা। এখন আরেকটা চলে গেল। আরো কিছুক্ষণ পরে গেল তৃতীয়টা।

মিসির আলি আয়নার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভালো দেখিয়েছ। I am Impressed.

৪. তরিকুল ইসলামের বিরাট সমস্যা

তরিকুল ইসলামের বিরাট সমস্যা হয়েছে। হঠাৎ করে কুকুর ভীতি তাকে কাবু করে ফেলেছে। দোতলা থেকে তিনি নামতে পারছেন না। তার মনে হচ্ছে একতলায় নামলেই তিন দিক থেকে তিনি কুকুর এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েও তিনি স্বস্থি পাচ্ছেন না। কুকুরের খোজে। এদিক ওদিক দেখছেন। কালো রঙের কিছু দেখলেই তাঁর বুক ধড়ফড় করছে। কপালে ঘাম হচ্ছে। কেন তিনি এত ভয় পাচ্ছেন নিজেও বুঝতে পারছেন না। ভয়টা সময়ের সঙ্গে বাড়ছে।

সকাল দশটা । তিনি নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে আছেন। কারণ এখন তাঁর মনে হচ্ছে তিনটা কুকুরই সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে আসবে। তারা আজ দিনের মধ্যেই একটা ঘটনা ঘটাবে। তরিকুল ইসলামের ইচ্ছা! করছে এই অঞ্চল ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যেতে। বড় কোনো শহরে যেখানে কুকুরের উৎপাত নেই।

দেবার ক্ষমতা নেই তারপরেও তিনি ভীত গলায় বললেন, কে?

আমি মিসির আলি দরজা খুলুন। আমি আপনার কুকুর ভীতি সারিয়ে ি িন্ত।

কি ভাবে?

হিপানোটিক সাজেশান বলে একটা পদ্ধতি আছে। ঐ পদ্ধতিতে। তরিকুল ইসলাম বললেন, কোনো পদ্ধতিতে কিছু হবে না ভাই সাহেব। তাবিজ কবচ লাগবে।

মিসির আলি বললেন, হিপিনোটিক পদ্ধতি কাজ না করলে অবশ্যই তাবিজ কবিচে যাওয়া হবে। আগে দেখি কাজ করে কি-না। দরজা খুলুন। সিঁড়ির গোড়ায় আমি মাজেদকে লাঠি হাতে দাঁড়া করিয়ে দিয়েছি। কুকুর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারবে না। বাড়ি দিয়ে কোমর ভেঙে দেবে।

তরিকুল ইসলাম দরজা খুললেন। কাতর গলায় বললেন, কাল সারারাত জেগে ছিলাম। এক সেকেন্ডের জন্যে চোখের পাতা এক করতে পারি নাই। শেষ রাতে একটু ঝিমুনির মতো এসেছে তখন স্বপ্নে দেখি দুটা কুকুর আমার দুই পা কামড় দিয়ে ধরে আছে আর বড়টা ছিড়ে ছিড়ে আমার পেটের নাড়ি-ভূড়ি খাচ্ছে।

মিসির আলি বললেন, শান্ত হোন তো ভাই! দেখি সমস্যার সমাধান করা যায় কি-না।

তরিকুল ইসলাম চিন্তিত ভঙ্গিতে মেঝেতে বসে আছেন। তাঁর তিন ফুট সামনে মিসির আলি। মিসির আলির হাতে পকেট ঘড়ির চেইন। চেইনের মাথায় ঘড়ি। তিনি ঘড়িটা পেন্ডুলামের মতো সামান্য দুলাচ্ছেন। তাদের বাঁ দিকে খাটের উপর আয়না বসে আছে। আয়নার চোখে তীব্র কৌতূহল। আয়নার পাশেই তার মা। ঘোমটা টেনে তিনি নিজেকে আড়াল করেছেন। মহিলা কিছুটা ভয় পাচ্ছেন। তিনি এক হাতে মেয়েকে শক্ত করে ধরে আছেন।

মিসির আলি বললেন, হেডমাস্টার সাহেব!

জ্বি।

আপনি সারারাত ঘুমান নি এখন আপনার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসছে।

জ্বি।

আপনি কল্পনা করুন নতুন একটা জায়গায় বেড়াতে গেছেন। জায়গাটা ফাঁকা। গাছপালা ছাড়া আর কিছু নেই! জায়গাটা কি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছেন? চোখ বন্ধ করে কল্পনা করুন।

তরিকুল ইসলাম চোখ বন্ধ করে গাঢ় স্বরে বললে, দেখতে পাচ্ছি।

জায়গাটা কেমন একটু বলুন তো?

সুন্দর। খুব সুন্দর। ফুলের বাগান আছে।

ঠাণ্ডা বাতাস কি বইছে?

জি।

ফুলের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছেন না?

পাচ্ছি।

একটা পুরানো কাঠের বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন?

হুঁ।

দোতলা বাড়ি না?

জ্বি।

খুঁজে দেখুন দোতলায় উঠার সিঁড়ি আছে। সিঁড়িটা বের করুন।

আচ্ছা।

সিঁড়ি খুঁজে বের করে আমাকে বলুন। সিঁড়ি পেয়েছেন?

পেয়েছি।

এখন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করুন। এক একটা ধাপ উঠবেন। আর আপনার চোখ গাঢ় হতে থাকবে। সপ্তম ধাপে উঠে গভীর ঘুমে আপনি তলিয়ে যাবেন। উঠতে শুরু করুন। প্রথম ধাপ উঠেছেন?

জ্বি উঠেছি।

দ্বিতীয় ধাপ?

হুঁ।

ঘুম পাচ্ছে।

হুঁ।

তৃতীয়।

হুঁ।

আপনার শরীর ভারী হয়ে গেছে। আপনার পা তুলতেও কষ্ট হচ্ছে চতুর্থ ধাপ। উঠেছেন?

হুঁ।

চতুর্থ, পঞ্চম এখন সপ্তম ধাপ উঠবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়বেন। আপনি পা দিয়েছেন সপ্তম ধাপে।

তরিকুল ইসলাম বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। তাঁর মাথা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে এসেছে। আয়না। আপলক তাকিয়ে আছে।

মিসির আলি বললেন, তরিকুল ইসলাম সাহেব।

জ্বি।

ঘুমাচ্ছেন?

জ্বি।

আপনার কেমন লাগছে?

ভালো।

আমি দু'বার হাত তালি দেব। তালির শব্দে আপনার ঘুম ভাঙবে। ঘুম ভাঙার পর আপনি কুকুর ভয় পাবেন না। কুকুর ভীতি আপনার পুরোপুরি দূর হবে।

মিসির আলি দু'বার হাত তালি দিলেন। তরিকুল ইসলাম চোখ মেললেন। এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। আয়না বলল, বাবা কুকুরের ভয়টা কি গেছে?

অরিকুল ইসলাম বললেন, কুকুরের কিসের ভয়?

আয়না বলল, তুমি স্যারের জন্যে মাছ কিনতে যাবে না?

তরিকুল ইসলাম বললেন, এখনই যাচ্ছি।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। স্বাভাবিক ভঙিতে এক তলায় নামলেন এবং মাছের সন্ধানে বের হয়ে গেলেন। কুকুর ভীতি এখন তাঁর আর নেই।*

[* এই বইয়ে লেখা হিপনোটিক সাজেশানের পদ্ধতিটি কেউ ব্যবহার করতে চাইলে সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। Trance states-এ চলে যাওয়া কাউকে ভুল সাজেশান কখনোই দেয়া ঠিক না। এতে বড় ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।–হুমায়ূন আহমেদ।]

কদম গাছের নিচে বেতের চেয়ার পাতা হয়েছে। আজ কুয়াশা কম। মিসির আলি ছাত্রের ডায়েরি নিয়ে বসেছেন। তাকে চা দেয়া হয়েছে। চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন।

মাজেদি অসাধ্য সাধন করেছে। সে মিসির আলির চুল টেনে দিচ্ছে। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার মিসির আলির ভালো লাগছে। ঘুম ঘুম ভাব হচ্ছে। মিসির আলি মাজেদের সঙ্গে গল্প করছেন।

মাজেদ মিয়া!

জি স্যার।

চুল টানা কোথায় শিখেছিস?

মাজেদ বলল, লেখাপড়া শিখা লাগে। এইগুলা শিখা লাগে না।

কিছু একটা শেখাতো উচিত। লেখাপড়াটা শিখ।

আপনে বললে শিখব। তয় সমস্যা আছে।

কি সমস্যা?

বেতন দেয়া লাগে। মা একবার আমার ইসকুলে দিতে চাইল। বাপজান তারে দিল দাবর।

দাবর কি?

বড় ধমকরে বলে দাবর।

দাবর দিয়ে কি বলল?

বাপজান বলল, এই বান্দি! ইসকুলে যে দিবি পুলার বেতন কে দিব? তর বাপে দিব?

নিজের স্ত্রীকে বান্দি বলা এটা কেমন কথা।

মাজেদ বলল, আমার ব্যাপজানের মতো যারা গরিব তার পরিবারেরে বান্দি বললে দোষ হয় না।

মিসির আলি বললেন, তোর অনেক বুদ্ধি। তোকে পড়াশোনা করতেই হবে। বেতন আমি দিব। ঠিক আছে?

জে ঠিক আছে। তয় বাপজানের কাছে টেকা দিয়া দিয়া গেলে বাপজান খরচ কইরা ফেলব। হেড স্যারের কাছে টাকা দিয়া পেলে ভালো হয়।

মিসির আলি বললেন, সবচে ভালো হয় তুই যদি আমার সঙ্গে ঢাকায় যাস। আমি লেখা পড়া দেখিয়ে দিতে পারব। যাবি?

মাজেদি বলল, এক জোড়া স্যান্ডেল। কিন্যা দিলে যাব। শহর বন্দরে খালি পায়ে যাওয়া ঠিক না। এই জন্যে সেন্ডেল।

সেন্ডেল অবশ্যই কিনে দেব। এখন খেলতে যা। চুল টানতে হবে না।

আমি যে আপনের লগে যাইতেছি মারে বলব?

অবশ্যই বলবি। মা'কে বলবি, বাবাকে বলবি। তাদের অনুমতি নিতে হবে না?

মিসির আলি ডায়েরি পড়ায় মন দিলেন। ডায়েরি আজ দিনের মধ্যেই পড়ে শেষ করতে হবে। আগামীকাল ঢাকায় চলে যাবেন। হাতে সময় নেই।

শ্রাবণ মাসের শেষে আমি আয়নাকে নিয়ে এলাম। সে আগ্রহ নিয়ে ঘর বাড়ি দেখল। বিশাল বারান্দা দেখে খুশি হলো। দুপুরে নিজেই রান্না করল, ডিম ভাজিল । ডাল রাঁধল। কাজের একটা বাচ্চা মেয়ে জোগাড় করে রেখেছিলাম আট নয় বছর বয়স। নাম আংগুর। তার চুল বেঁধে দিল। চুল বাঁধতে বাঁধতে অনেক গল্প করল।

নাম আঙ্গুর। আঙ্গুর। কখনো খেয়েছিস?

না।

আচ্ছা তোকে খাওয়াব। তোর স্যারকে বলব নিয়ে আসতে। বারান্দার টবে আঙ্গুরের চাষও করব। তুই গাছে নিয়মিত পানি দিবি। পারবি না?

পারব।

লেখাপড়া জানিস?

না।

লেখাপড়া শিখতে হবে। মুর্খ হয়ে থাকা যাবে না। তোর স্যারকে বলে তোকে স্কুলে ভরতি করিয়ে দেব।

আচ্ছা।

গান জানিস?

রূপবান পালার গান জানি।

গেয়ে শুনা।

আঙ্গুর মাথা নিচু করে গান ধরল, ও দাইমা। দাই মা গো।

আনন্দ আমার চোখে পানি এসে গেল। সুখী পরিবার শুরু হতে যাচ্ছে। আমি আত্মীয় পরিজন ছাড়া একজন মানুষ। সারা জীবন একা থেকেছি। আর এক থাকতে হবে না। সংসারে শিশু আসবে। সে হাসবে খেলবে। আমি হাঁটু গেড়ে ঘোড়া হব। সে ঘোড়ার পিঠে চড়বে। আয়না তাকে ঘুম পাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়বে—খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এলো দেশে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে?

সন্ধ্যা বেলায় পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে গেল। আয়না বিম মেরে গেল। কথা বললে তাকায়, জবাব দেয় না। আমি বললাম, তোমার কি শরীর খারাপ করেছে? সে না সূচক মাথা নাড়ল। রাতে খাবার খেল না। আমি বললাম, শরীর খারাপ লাগলে শুয়ে পড়।

আয়না বলল, আমি আলাদা শোব।

আলাদা শোবে মানে?

আয়না আঙ্গুল উঁচিয়ে গেস্ট রুম দেখিয়ে বলল, ঐ ঘরটায় শোব।

কেন?

আয়না আমার দিকে তাকিয়ে হাসল আর সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে মনে হলো সে আলাদা ঘুমাবে। এটাই তো স্বাভাবিক। সবার প্রাইভেসি আছে। একা ঘুমালে প্রাইভেসি রক্ষা হয়। স্বামীর সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমানো হচ্ছে মধ্যযুগের বর্বরতার মতো। আধুনিক যুগে স্বামী-স্ত্রী আলাদা আলাদা ঘরে বাস করবে। স্বামী তার নিজের মতো তার ঘর সাজাবে। স্ত্রী তার রুচি মতো সাজাবে।

আমি বললাম, অবশ্যই তুমি আলাদা ঘুমাবে। সেটাই উচিত এবং শোভন।

আয়না বলল, থ্যাংক য়ু।

তখনো আমি বুঝতে পারিনি যে আয়না আমার চিন্তা করার ক্ষমতা কনট্রোল করছে। তার ইচ্ছামতো ভাবতে আমাকে বাধ্য করছে। আমি আলাদা ঘুমুতে গেলাম। ভালো ঘুম হলো কড়া ঘুমের অনুধ খেলে যেমন ঘুম হয় তেমন ঘুম।

সকাল বেলা আয়না স্বাভাবিক হয়ে গেল। হাসি খুশি। আঙ্গুর মেয়েটাকে নিয়ে অনেকগুলি ফুলের টব কিনে বারান্দায় সাজাল। সতরঞ্জি কিনে আনল। বারান্দায় বিছিয়ে আসনের মতো করল। আমাকে বলল, এটা হলে আমার আসন। যখন আমার মন খারাপ থাকবে তখন আসনে বসে থাকব।

আমি বললাম, ভালো তো!

সন্ধ্যা হবার পর পর আয়না বারান্দায় বসল। আমার মনে হলো এটাই তো স্বাভাবিক। এখন তার কাছে যাওয়া হবে খুবই অনুচিত। সবারই নিজের আলাদা কিছু সময় থাকা দরকার। সে বারান্দায় বসে নিজের মনে ভাবছে ভাবুক না।

আমি এক রাতের খাবার খেয়ে ঘুমুতে গেলাম। মরার মতো ঘুমালাম। ঘুম ভাঙল আয়নার ডাকে। সে চা বানিয়ে এনেছে। আয়না বলল, দশটা বাজে, এখনো ঘুমাচ্ছ? সকালে তোমার ক্লাস নাই?

ক্লাস নিলাম। ছাত্রভর্তি বিষয়ে প্রিন্সিপ্যাল স্যার কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন তার পিছনে সময় দিলাম। ছাত্রদের হোস্টেলে দুই দলে মারামারি হয়েছে! আমি হোস্টেলের অ্যাসিসটেন্ট সুপার। দুই দলকে শান্ত করার প্রক্রিয়ায় বেশ সময় গেল। আমি নানান কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত

কিন্তু মন পড়ে আছে বাসায়। সারাক্ষণ আয়নাকে নিয়ে ভাবছি। আমি যে তার হাতের পুতুল হয়ে গেছি। এই বিষয়টা পরিষ্কার।

গভীর প্রেম মানুষকে পুতুল বানিয়ে দেয়। প্রেমিক প্রেমিকার হাতের পুতুল হন কিংবা প্রেমিকা হয় প্রেমিকের পুতুল। দু'জন এক সঙ্গে কখনো পুতুল হয় না। কে পুতুল হবে। আর কে হবে সূত্রধর তা নির্ভর করে মানসিক ক্ষমতার উপর। মানসিক ক্ষমতা যার বেশি তার হাতেই পুতুলের সূতা।

আমার সূতা আয়নার হাতে। সে আমাকে নিয়ে খেলছে। কিন্তু কেন? আমার জন্য তার কোনো ভালোবাসা কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না। সে আছে সম্পূর্ণ তার নিজের ভুবনে।

মিসির আলি খাতা বন্ধ করলেন। তরিকুল ইসলাম মাছ নিয়ে ফিরেছেন। হাসি মুখে বললেন, আপনি বিরাট ভাগ্যবান মানুষ। আপনার কপালের কারণে এত বড় কৈ মাছ পেয়েছি। দেখেন মাছ দেখেন। ছবি তুলে রাখার মতো মাছ।

মিসির আলি চোখে-মুখে আগ্রহ ফুটিয়ে মাছ দেখলেন।

এই সাইজের কৈ কখনো দেখেছেন?

না।

পেটের আশে লাল চকচকে ভাব দেখছেন?

জ্বি।

এটা হলো রানী কৈ-এর লক্ষণ।

মিসির আলি বললেন, কৈ মাছে রাজা-রাণী আছে?

অবশ্যই আছে। আজ হলো কৈ দিবস। কৈ মাছের ভাজা খাবেন। মটরশুটি দিয়ে ঝোল খাবেন। আরেকটা আইটেম হলো কৈ মাছের ভর্তা।

কৈ মাছের ভর্তাও হয়?

তরিকুল ইসলাম আনন্দিত গলায় বললেন, আপনারা যারা শহরবাসী তাদের ধারণা শুধু টাকি মাছের ভর্ত হয়। কৈ মাছেরও ভর্ত হয়। কৈ ভতাঁর পাশে অন্য ভর্তা দাঁড়াতেই পারবে না। আজকের প্রতিটা আইটেম আমি রান্না করব।

আপনি রাধতেও পারেন?

তরিকুল ইসলাম বললেন, ভালো কোনো মাছ পেয়ে গেলে অন্যের হাতে ছাড়তে ইচ্ছা করে না।

রান্না শিখেছেন কোথায়?

মা'র কাছে শিখেছি। মা রান্না করতেন। আমি পাশে বসে থাকতাম। আজ আমি রান্না করব। আপনি পাশে বসে থাকবেন। রান্না দেখার মধ্যেও আনন্দ আছে,

মিসির আলি অবাক হয়ে লক্ষ করলেন রান্না দেখে তিনি আনন্দ পাচ্ছেন। রান্না বিষয়টাতে যে এত ধরনের জটিলতা আছে তা তিনি আগে লক্ষ করেন নি। আগুনের আঁচ বাড়ানো হচ্ছে, কমানো হচ্ছে। পাতিলের উপর কখনো ঢাকনা দেয়া হচ্ছে কখনো বা সরিয়ে ফেলা হচ্ছে।

তরিকুল ইসলাম বললেন, আজ খাওয়া শুরু হবে উচ্ছে ভাজি দিয়ে। ভয়ংকর তিতা। তিতা দিয়ে শুরু করলে কি হয় জানেন?

কি হয়?

প্রথমেই শরীরের সিস্টেটমে ধাক্কা লাগে। শরীর সেই ধাক্কা খেয়ে অন্য খাবারগুলির জন্যে তৈরি হয়। বাকি খাবারগুলি তখন অসাধারণ লাগে।

রান্না চলেছে আর চলছে তরিকুল ইসলাম সাহেবের মুখ। তিনি কথার রেলগাড়ি চালিয়েছেন। সব কথাই খাদ্য সম্পর্কিত।

মিসির আলি সাহেব! রিটা মাছ খেয়েছেন?

খেয়েছি মনে হয়। নামে মনে করতে পারছি না।

রিটা এমন মাছ যে একবার খেলে ভুলবেন না। রিটা সম্পর্কে কবিতাই আছে–

রিটা
হাড়ে গোশতে মিঠা।

মিসির আলি বললেন, একবার খেয়ে দেখতে হয়।

তরিকুল ইসলাম বললেন- ঢাকা শহরে এই মাছ পাবেন ঠিকই— সবই মরা। বরফ দেয়া। রিটা মাছ জীবন্ত অবস্থায় কিনতে হয়। কাটার দশ মিনিটের মাথায় রান্না করতে হয়। দশ মিনিট পরে রান্না করবেন মাছ লাগবে। বালির মতো।

তাই না-কি?

অবশ্যই। মহাশোল খেয়েছেন? আমরা বলি মাশুল। পাহাড়ি নদীর মাছ। অনেকটা রুই মাছের মতো তবে মুখটা রুই মাছের চেয়ে লম্বা। হঠাৎ হঠাৎ পাওয়া যায়।

মাশুল মাছ নিয়ে কোনো ছড়া কি আছে?

অবশ্যই আছে-মাশুল মাছ আইছে। জমি কেইচা খাইছে। এই মাছ রান্না হলে শ্বশুর জামাইকে না দিয়ে নিজে খায়।

খাওয়া দাওয়া মিসির আলির কাছে কখনোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তরিকুল ইসলামের পাল্লায় পড়ে তাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। কৈ মাছ তিনি বেশ আরাম করেই খেলেন।

দিনের বেলা ঘুমানোর অভ্যাসও ছিল না। আজ খাওয়া দাওয়ার পর লেপ গায়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায়। চোখ মেলেই দেখেন চায়ের কাপ হাতে আয়না দাঁড়িয়ে। আয়না বলল, এই নিয়ে আপনার কাছে তিনবার এসেছি। আপনি ঘুমুচ্ছিলেন দেখে জাগাই নি। বিছানায় বসে চা খাবেন না। কারান্দায় বসবেন?

মিসির আলি বললেন, বিছানাতেই বসি। তুমিও চেয়ার টেনে বস। আমার ধারণা তুমি কিছু বলতে চাও। সেটা কি?

হিপনোটিক সাজেশনের বিষয়টা জানতে চাই। এত সহজে একজনকে ঘুম পাড়ানো যায়। আমি জানতাম না।

মিসির আলি বললেন, মানুষের ব্রেইন অদ্ভুত কোনো কারণে এমন ভগবে তৈরি যে অন্যের কথায় প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়। কারো সামনে চোখ বন্ধ করা মানে তার আয়ত্তে চলে যাওয়া।

কেন এ রকম?

মিসির আলি বললেন, আমি পুরোপুরি জানি না। তবে এর Deep rooted কারণ থাকতে পারে। শুরুতে মানবগুষ্ঠি ভয়ংকর বিপদে থাকতো। তাদেরকে দলপতির সব কথা শুনতে হতো। দলপতির নির্দেশ না মানার অর্থ হচ্ছে মৃত্যু। বিশেষ করে রাতে, যখন চারদিক অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমাদের জীন সেই ভাবেই তৈরি। আমরা অতি সুসভ্য প্রাণী কিন্তু আমাদের একটা অংশ প্রাচীন পৃথিবীর।

আয়না বলল, আপনি যখন কাউকে সাজেশন দিচ্ছেন তখন সে আপনাকে লিডার মানছে। যা করতে বলছেন তাই-সে করছে?

অনেকটা সে রকম।

আমাকে হিপনোটাইজ করতে পারবেন?

চেষ্টা করে দেখতে পারি।

আমি কি আপনাকে হিপনোটাইজ করতে পারব? আপনি যে ভাবে করেছেন সে ভাবে।

মিসির আলি বললেন, পারবে। কারণ আমি তোমাকে সাহায্য করবো। প্রাণপণে নিজেকে আড়াল রাখার চেষ্টা করব না। তাছাড়া প্রকৃতি প্রদত্ত এই ক্ষমতা তোমার ভালোভাবেই আছে। তোমার স্বামীকে তুমি তোমার ছবি আয়নায় দেখিয়েছ। হিপনোটাইজ করেই দেখিয়েছ।

কেন বলছেন?

প্রথমে তুমি তোমার স্বামীকে টেলিফোন করলে। অনেকদিন তোমার সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই। সে তোমার কণ্ঠস্বর শুনেই মন্ত্রমুগ্ধ। তখন তাকে বললে আয়না দেখতে। সে সাজেশান পেয়ে গেল। তার প্রবল তৃষ্ণা হলো আয়নায় তোমাকে দেখার। দেখতে পেল। আয়নায় মানুষ নিজের ছবি দেখে। সে কিন্তু নিজের ছবি দেখেনি। এর অর্থ একটাই আয়নার পুরো ব্যাপারটাই তার কল্পনা।

আয়না বলল, স্যার আরেক কাপ চা-কি আপনাকে দেব?

মিসির আলি বললেন, আর চা খাব না।

আয়না বলল, আগামীকাল চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

আয়না মাথা নিচু করে হাসল। মিসির আলি বললেন, হাসছ কেন?

আয়না বলল, আগামীকাল আপনি যেতে পারবেন না।

কেন যেতে পারব না?

আয়না বলল, ঘুম ভাঙার পর আপনার মনে হবে কি দরকার ঢাকা যাওয়ার? আরো কয়েকটা দিন থাকি। ঢাকায় আমার তেমন জরুরি কাজও তো নেই। এখানে দুদিন থাকবেন বলে এসেছিলেন। স্যার সাতদিন পার হয়েছে। এত দিন পার হয়েছে আপনি নিজেও কিন্তু জানেন না।

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, সাত দিন পার হয়েছে! কি বল তুমি?

আয়না বলল, জ্বি স্যার সাত দিন। আমি আপনাকে আটকে রেখেছি। আমি যখন আপনাকে যেতে দেব তখন যেতে পারবেন। তার আগে না।

মিসির আলি বললেন, তোমার ধারণা তোমার অনেক ক্ষমতা?

আয়না শান্ত গলায় বলল, স্যার আমার অনেক ক্ষমতা। আমি নিজে না বললে আমার বিষয়ে আপনি কিছুই জানতে পারবেন না। আপনার ছাত্রও কিছু বুঝতে পারে নি। আপনি শুধু শুধুই তার খাতা পড়ছেন।

পড়া বন্ধ করতে বলছ?

না।

আমাকে যেতে দিচ্ছ না কেন?

আয়না বলল, মনে হয় আমি আপনার প্রেমে পড়েছি।

হতভম্ব মিসির আলি বললেন, কি বলছ তুমি?

আয়না বলল, প্রেমে পড়া অতি তুচ্ছ এবং হাস্যকর একটা জৈবিক বিষয়। এখানে আধ্যাত্মিকতার কিছু নেই। আমি আপনার ছাত্রের স্ত্রী নই। আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আমার প্রেমে পড়তে সমস্যা কি? আমি আপনার সঙ্গে ঢাকা যাব। মাজেদি একা কোন যাবে?

মিসির আলি তাকিয়ে আছেন। তার বুক ধড়ফড় করছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। কি বলছে এই মেয়ে।

আয়না বলল, স্যার আপনি এত নার্ভাস হয়ে গেছেন কেন? আমি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছি। আপনি লজিক বুঝেন, কত কিছু বুঝেন। ঠাট্টা বুঝেন না? আশ্চর্য তো।

বিড়ালের ম্যাও ম্যাও শব্দ আসছে। মিসির আলি বারান্দায় এসে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখলেন। মাজেদের কোলে মিশমিশে কালো এক বিড়াল। হেডমাস্টার সাহেব বিড়ালটার পা চেপে ধরে আছেন। বিড়াল উদ্ধার পাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে কামড়াতেও যাচ্ছে।

মিসির আলি বললেন, কি ব্যাপার?

তরিকুল ইসলাম বললেন, গলায় কৈ মাছের কাটা ফুটেছে। কৈ মাছের কাটা বরাশির মতো। একবার ফুটলে ছাড়ন নাই। এই কারণেই বিড়ালের পা ধরে বসে আছি।

বিড়ালের পা ধরলে গলার কাঁটা যাবে?

তরিকুল ইসলাম বললেন, অবশ্যই যাবে। গলার কাঁটা দূর করার এটাই একমাত্র অসুধ। প্রতিটি পা একবার করে ধরতে হয়। তিনটা পা ধরেছি। একটা বাকি আছে। ঐটা ধরা মাত্র কাঁটা চলে যাবে।

তরিকুল ইসলাম চতুর্থ পা ধরলেন। বিড়াল তাঁকে কামড়াতে গেল। তিনি পা ছেড়ে দিয়ে বললেন, কাঁটা নাই। বিদায়।

৫. ছাত্রের ডায়েরি

মিসির আলি ছাত্রের ডায়েরি নিয়ে বসেছেন। অল্প কিছু পাতা বাকি। এই পাতাগুলিতে হঠাৎ হঠাৎ কিছু অসংলগ্ন বাক্য ঢুকে পড়েছে। যেমন তারকা চিহ্ন দিয়ে লেখা-পাচ্ছি না কেন? রুলার রুলার।' লবণ নাই। পাঁচটা পুরো পাতা আছে উল্টো করে লেখা শুধুমাত্র আয়নার সামনে ধরলেই পড়া যায়। Dyslexia নামক ব্যাধির রোগীরা এই ভাবে লেখে। তার কি Dyslexia আছে?

মিসির আলি উল্টো করে লেখা অংশটা আগে পড়লেন। তার আয়না প্রয়োজন হলো না। পড়তে কিছু বেশি সময় লাগল। তাঁর ছাত্র ফারুক লিখেছে।

এই অংশে আমি কিছু অদ্ভুত কথা লিখব। কথাগুলি সাধারণ ব্যাখ্যার বাইরে। সরকারি ছুটির দিন। আমি কলেজে যাই নি। কান্নার শব্দ শুনে উঠে গেলাম। আঙ্গুর কাদছে। আমার কাজের মেয়ে আঙ্গুর খুব ভয় পেয়েছে। সে বসার ঘরের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে কাঁদছিল। আমি তাকে পর্দার আড়াল থেকে বের করলাম। বললাম, কি হয়েছে?

সে বলল, ভয় পাইছি।

কখন ভয় পেয়েছিস?

সকালে।

দিন দুপুরে কিসের ভয়! কি দেখে ভয় পেয়েছিস?

মেয়েটা কিছু বলে না। শুধু কাঁদে আর এদিক ওদিক তাকায়। বড় বড় করে নিঃশ্বাস নেয়। কাঁদতে কাঁদতে তার হেচকির মতো উঠে গেল। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত অবস্থা। মেয়েটির একটিই কথা সে এই বাড়িতে থাকবে না। এখুনি চলে যাবে।

তার ভয় পাওয়া বিষয় নিয়ে যে আয়নার সঙ্গে আলাপ করব সে উপায়। নেই। আয়নার নতুন অভ্যাস হয়েছে। নদীর পাড়ে যাওয়া। সে নদীর পাড়ে ঘন্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। আমাদের কলেজের পাশেই নদী, নাম বড় গাঙ্গ। আয়না খুঁজে খুঁজে নদীর পাড়ে একটা ছাতিম গাছ বের করেছে। সে গাছের গুড়িতে বসে থাকে। তাকে নিয়ে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কানায়ুষাও আছে। যেমন তার মাথার ঠিক নাই। সে নিজে নিজে হাত নেড়ে কথা বলে, হাসে।

আমি আঙুরকে শান্ত করার অনেক চেষ্টা করলাম। লাভ হলো না। আমি বললাম, আয়না ফিরুক তারপর তোকে আমি তোর বাড়িতে দিয়ে আসব। আঙ্গুর তাতেও রাজি না। তাকে এখনই দিয়ে আসতে হবে। সে আর এক মুহূর্তের জন্যেও থাকবে না। থাকলে না-কি সে মরে যাবে।

বাধ্য হয়েই আমি তাকে নিয়ে রওনা হলাম। তার বাবা মা শহরের এক বস্তিতে থাকে। রিকশায় যেতে পনেরো বিশ মিনিট লাগে। রিকশায় উঠে আঙ্গুর স্বাভাবিক হয়ে গেল। আমাকে ভয় পাওয়ার ঘটনা নিচু গলায় বলল।

যে ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল। তার আপামণি আয়নার সামনে বসে চুল আচড়াচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখে আপামণির হাত থেকে চিরুনী পড়ে গেছে আর আপামণি আয়নাটার ভেতর ঢুকে গেছে।

আমি তার কথার কোনো গুরুত্ব দিলাম না। কি দেখতে কি দেখেছে। মানুষ আয়নার ভেতর ঢুকে যাবে কি ভাবে? সে যদি বলতে আপামণি হঠাৎ শূন্যে মিলিয়ে গেছে তাও একটা কথা হতো। মানুষের চোখে Blind spot বলে একটা ব্যাপার আছে। হঠাৎ কোনো বস্তু Blind spot এ পড়ে গেলে তা দেখা যায় না। ফেরাউনের কিছু যাদুকর Blind spot-এর বিষয়টা জানতেন। তার সাহায্যে তাঁরা জীবন্ত বস্তু অদৃশ্য করার খেলা দেখাতেন।

আমি আয়নাকেও কিছু বললাম না। আঙ্গুর তার বাবা-মা'কে দেখার জন্যে হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে কয়েকদিনের জন্যে তাকে বাবা-মা'র কাছে রেখে এসেছি। এইটুক বললাম। আয়না বলল, তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। মেয়েটাকে ছাড়া বাসাটা খালি খালি লাগছে।

আমি বললাম, আচ্ছা।

আয়না বলল, মেয়েটাকে আমার খুব পছন্দ। তাকে পালক নিলে কেমন হয়? আমাকে মা ডাকবে। তোমাকে বাবা ডাকবে।

আমি বললাম, মেয়েটাকে পালক নিতে হবে কেন? আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়ে হবে। তারা বাবা-মা ডাকবে।

আয়না বলল, আমাদের ছেলেমেয়ে হবে না।

আমি বললাম, কেন হবে না?

আয়না তার জবাব না দিয়ে আমার সামনে থেকে উঠে বারান্দায় চলে গেল। তার পছন্দের জায়গায় গিয়ে বসল। তার বারান্দায় বসার অর্থ এক দুই ঘণ্টা সে ঝিম ধরে থাকবে। হাত নাড়বে, বিড় বিড় করবে।

ছোট মেয়েটার অনুপস্থিতি যে আমাদের জীবনযাত্রায় বড় কোনো পরিবর্তন আনল তা না। সব কিছু আগের মতো চলতে লাগল। আয়না গুছিয়ে সংসার করে। সে যে কাজ করছে— বাসন ধুচ্ছে কাপড় ধুচ্ছে কিংবা রান্না করছে তা বুঝাই যায় না। তার সব কাজকর্ম নিঃশব্দ।

আমি একটা ঠিক বুয়া রাখতে চেয়েছিলাম। সে রাজি হলো না। সে বলল, ওদের গা থেকে আমি নোংরা গন্ধ পাই। আমার শরীর ঘিনঘিন করে। গন্ধ বিষয়ে আমার সমস্যা আছে। আয়নার এই কথা খুবই সত্যি। মাছের গন্ধ সে সহ্যই করতে পারে না। আমাদের বাসায় মাছ রান্না হয় না।

পাশের ফ্ল্যাটের মাছ রান্নাও সে নিতে পারে না। সারাক্ষণ নাকে রুমাল চাপা দিয়ে রাখে কিংবা নদীর পাড়ের ছাতিম গাছের নিচে বসে থাকে।

আয়নার সঙ্গে আমার কথাবার্তাও তেমন হয় না। আমি প্রশ্ন করলে জবাব দেয় তাও সবসময় না। মাঝে মাঝে অদ্ভুত কথা বলে আমাকে চমকে দেয়। যেমন একদিন বলল, ফ্ল্যাট থ্রি-বি-তে একটা কালো লম্বা ছেলে থাকে দেখেছ? গোফ আছে। সব সময় মাথা নিচু করে হাঁটে। খুব সিগারেট খায়।

আমি বললাম, দেখেছি।

তাকে চেন?

চিনি। ওর নাম মুকসেদ। বাংলার প্রফেসার জালাল সাহেবের শালা। চাকরির খুঁজে এসেছে।

আয়না বলল, ও একটা খুনি। পাঁচটা খুন করেছে।

আমি চমকে উঠে বললাম, কি বল তুমি।

আয়না বলল, মানুষ কারণে খুন করে। টাকা পয়সার জন্যে করে, শত্রুতার জন্যে করে, আর এই লোকটা কারণ ছাড়া খুন করে।

আমি বললাম, মনগড়া কথা কখনো বলবে না। মুকসেদের মতো শান্ত, নরম এবং ভদ্রছেলে আমি কখনো দেখিনি।

আয়না বলল, সে পুলিশের হাতে ধরা পড়বে, পুলিশ তাকে খুঁজছে।

আমি বললাম, টেলিপ্যাথির মাধ্যমে সব জেনে ফেলেছ? না-কি স্বপ্নে জেনেছ?

আয়না বলল, কি ভাবে জেনেছি। আমি জানি না। তবে জেনেছি। প্রফেসর সাহেব ঐ খুনিটার দুলাভাই না। তিনি সব জেনেশুনে খুনিটাকে আশ্রয় দিয়েছেন। খুনিটার নাম মুকাসেদ না। তার নাম কামাল।

যাদের খুন করেছে তাদের নাম কি?

মেয়েটার নাম বলতে পারি। তার নাম শিউলি। মেয়েটাকে প্রথম সে পাট ক্ষেতে টেনে নিয়ে গিয়ে রেপ করেছে তারপর খুন করেছে।

আমি তাকিয়ে আছি। আয়নার উদ্ভট কথাবাতাঁর কোনো অর্থ করতে পারছি না। এটা কি প্যারানিয়া?

আয়না বলল, তুমি কি থানার ওসি সাহেবকে বলবে যে কামাল এখানে লুকিয়ে আছে।

আমি বললাম, উদ্ভট কথাবার্তা বলবে না। কোনো কারণ ছাড়া আমি ওসি সাহেবকে বলব যে আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে একজন খুনি ঘাপটি মেরে আছে?

আয়না ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, থাক বলতে হবে না। যা হবার আপনাতেই হবে। কয়েকদিন আগে আর পরে। খুনিটার ফাঁসি হবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে-ফাঁসির দড়িতে ঝুলেও সে কিন্তু মরবে না। দীর্ঘ সময় ঝুলন্ত অবস্থায় বেঁচে থাকবে এবং চোখের সামনে ভয়ংকর সব দৃশ্য দেখবে। তার কাছে মনে হবে সে অনন্তকাল এইসব দৃশ্য দেখছে।

আমি বললাম, তুমি তার ভবিষ্যত চোখের সামনে দেখে ফেলেছ?

আয়না হাসল আর কিছু বলল।

আয়নার সঙ্গে খুনি মুকাসেদ বিষয়ে কথাবার্তা বলার দ্বিতীয় দিনে পুলিশ এসে মুকসেদ এবং প্রফেসর জালাল সাহেবকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল। আমি প্রিন্সিপ্যাল সাহেব এবং চারজন শিক্ষককে নিয়ে থানায় ছুটে গোলাম। জালাল সাহেবকে অ্যারেস্ট করেছে। একজন সিনিয়র শিক্ষক। ওসি সাহেব বললেন, এই ভয়ংকর খুনী এখানে লুকিয়ে আছে আমরা জানতাম না। কিভাবে টের পেলাম সেই ইতিহাস আপনাদের বলতেই হবে। জগতে কত রহস্য যে আছে। ঘটনা হয়েছে কি— শরীরটা খারাপ লাগছিল। আমি থানা থেকে দুপুর বেলা বাসায় গেলাম। খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছি হঠাৎ স্বপ্নে দেখি অতি অপরূপ এক মেয়ে আমাকে বলছে- ওসি সাহেব! ঘুম থেকে উঠুন। ভয়ংকর খুনি কামাল কোথায় আছে আমি জানি। এই হলো ঠিকানা। সে ঠিকানা বলল। একবার না, কয়েকবার।

আমার ঘুম ভাঙল। ইউনিফর্ম পারলাম। আর্মড পুলিশ নিয়ে ফ্ল্যাট ঘেরাও করলাম। হারামজাদাটাকে পেয়ে গেলাম।

আমার স্ত্রী যে অস্বাভাবিক ক্ষমতা নিয়ে এসেছে এই বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ কখনোই ছিল না। ক্ষমতার ব্যাপ্তিটা কতটুকু তা ধরতে পারছিলাম না। প্যারা নরমাল জগতে সাইকিক ক্ষমতা সম্পন্ন অনেক মানুষের উদাহরণ আছে। ডকুমেন্টেড সব ঘটনা। রাশিয়ার এস বেলায়েভ নামের একজন শৌখিন চিত্রকর পদার্থবিদদের সামনে তিন মিনিট লেভিটেসনে ছিলেন। মেঝে থেকে এক ফুট উঁচুতে ভেসে মাধ্যকর্ষণ শক্তিকে কাঁচকলা দেখিয়েছেন। সায়েন্টিস্টরা কিছুই ধরতে পারেন নি।

ইসরায়েলের য়ুরি গেলার চোখের দৃষ্টিতে চামচ বাঁকা করতে পারতেন। ম্যাজিশিয়ানরা দাবি করেন এখানে কিছু ম্যাজিকের কৌশল আছে। য়ুরি গেলার বিবিসি টেলিভিশনে চামচ বাঁকানো দেখালেন।

তাকে ঘিরে রইল সায়েনটিস্ট এবং ম্যাজিশিয়ান। কেউ কিছু ধরতে পারল না।

আমেরিকার ABC টেলিভিশন মার্থা নামের আট বছর বয়েসী একটি মেয়েকে নিয়ে এক ঘন্টার প্রোগ্রাম করেছিল। সে যে কোনো মানুষের দিকে তাকিয়ে মানুষটা কি ভাবছে বলতে পারত। এই মেয়েটি অদ্ভুত একটা কথা বলত। সে বলত মানুষের মনের কথা বুঝার ব্যাপারটায় তাকে আয়না সাহায্য করে। ঘরে আয়না না থাকলে সে কিছু বলতে পারে না। সে বলত পৃথিবীতে যেমন একটা জগৎ আছে। আয়নার ভেতরেও একটা জগত আছে। আয়নার মানুষরা পৃথিবীর মানুষের মতোই তবে তাদের অনেক ক্ষমতা। আয়নার ভেতরের জগতে কোনো পাপ নেই। পৃথিবীতে পাপ আছে।

মার্থাকে জিজ্ঞেস করা হলো—পাপ কি?

উত্তরে মার্থা ভুরু কঁচকে বলল, পাপ হচ্ছে ঈশ্বরের অন্ধকার (Dark side of God)

আমার স্ত্রী আয়না কি মার্থার কথার আয়না জগতের কোনো মানবী? আমি তার উত্তর জানি না। তবে আঙুরের মতো আমিও এক রাতে আমার স্ত্রীকে আয়নার ভেতর ঢুকে যেতে দেখলাম। ঘটনাটা এ রকম—

আয়না তার ঘরে বসেছিল। তার সামনে বড় একটা আয়না। সে এক দৃষ্টিতে আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি দূর থেকে তাকে দেখছি। আমার দিকে সে পেছন ফিরে আছে বলে আমাকে দেখছে মা! আমি দেখলাম। সে আয়না কাছে টেনে নিল। আয়নায় চুমু খেল এবং চলে গেল আয়নার ভেতর। ব্যাপারটা এত সহজে ঘটল যে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। আমার মনে হলো আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। আমি কোনো রকমে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

কি আশ্চর্য! বারান্দায় আয়না হাঁটুর উপর মাথা রেখে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বাসা। সে আমাকে দেখে বলল, কি হয়েছে? তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? কোনো কারণে কি ভয় পেয়েছ?

আমি উত্তর দিলাম না। এক ত তার দিকে তাকিয়ে আছি। আয়না বলল, বোস। এখানে।

আমি বসলাম আর তখনি মনে হলো আমার সামনের জগৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে। চোখে স্পষ্ট কিছুই দেখছি না। চলে গেছি। অন্য কোনো ভুবনে। সেই ভুবনের আলো নরম। সব কিছু ছায়া ছায়া অস্পষ্ট। আমি বললাম, কোথায় আছি?

আয়নার গলা শুনতে পেলাম, সে বলল। এইতো আমার পাশে। আমার হাত ধর। আমি আয়নার হাত খুঁজে পাচ্ছি না। তাকে স্পষ্টভাবে দেখছিও না। আবার বললাম, আমি কোথায়?

আয়না বলল, আমরা আয়নার ভেতর চলে এসেছি। এখন থেকে আয়নার ভেতর থাকব। ভালো হয়েছে কিনা?

উল্টো করে লেখা অংশের এখানেই সমাপ্তি। মিসির আলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। উল্টো লেখা দীর্ঘ সময় পড়ার কারণে তার মাথা খানিকটা জট পাকিয়ে গেছে। চারপাশের জগৎ দুলছে। বুক ধ্বক ধ্বক করছে। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে মাথাকে সুস্থির হতে দিতে হবে। মিসির আলি চোখ বন্ধ করলেন। এর মধ্যে ঢুকাল মাজেদ। মাজেদ বলল, স্যার ঘুম গেছেন?

মিসির আলি বললেন, না।

ঢাকায় কবে যামু স্যার?

আজই যাব।

আমার স্যান্ডেল?

কিনে দিব।

স্যার মাথা মালিশ কইরা দিমু?

না। এখন বিরক্ত করিস না। আমি একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি।

চইলা যাব?

হ্যাঁ।

মাজেদ চলে গেল না। তার সামনে হাঁটাহঁটি করতে লাগল। মিসির আলি চোখ বন্ধ করেই বুঝতে পারছেন সে এখন কোথায়? যদিও মাজেদ হাঁটছে নিঃশব্দে। এইতো সে এখন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। মিসির আলি চোখ মেললেন। মাজেদ ঘরে নেই। ঘর ফাকা। মস্তিষ্ক তাকে বিভ্রান্ত করেছে। মিসির আলি আবারো চোখ বন্ধ করলেন। এই অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যে কয়েকটা ছাড়া ছাড়া স্বপ্ন দেখলেন। একটি স্বপ্নে বিশাল আয়নার ভেতর থেকে বাচ্চা মেয়ে বের হয়ে এল। স্বপ্নে সব কিছুই স্বাভাবিক মনে হয়। আয়নার ভেতর থেকে মেয়ে বের হয়ে আসার ঘটনাটা মিসির আলির কাছে স্বাভাবিক মনে হলো। বাচা মেয়েটি বলল, আমাকে চিনছেন?

মিসির আলি বললেন, তুমি মার্থা।

আমি কোথায় থাকি জানেন?

জানি। আয়না জগতে।

আমাকে নিয়ে যে বইটি লিখেছে সেই বই আপনি পড়েছেন?

পড়েছি।

বইটার নাম বলুন।

বইটার নাম- Little girl from the mirror.

আমি যাই।

কোথায় যাবে?

যেখান থেকে এসেছি সেখানে যাব।

মেয়েটি আয়নার ভেতর ঢুকে গেল।।

ঘুমন্ত মিসির আলিকে ডেকে তুললেন তরিকুল ইসলাম। তিনি বললেন, চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছেন এটা কেমন কথা? ভাই সাহেব শরীরটা খারাপ?

মিসির আলি বললেন, শরীর ঠিক আছে।

আপনার শরীর মোটেই ঠিক না। শরীর ঠিক থাকলে কেউ চেয়ারে বসে ঘুমায় না। আসুন বিছানায় শুয়ে থাকবেন। মাজেদকে বলছি পায়ে তেল মালিশ করে দেবে। যে কোনো অসুখে পায়ে তেল মালিশ মহৌষধ।

ভাই আমি ভালো আছি। আপনি বললে তো হবে না। আমি বুঝতে পারছি সমস্যা আছে। হাত ধরি, উঠেন তো।

মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। তিনি কিছুক্ষণের জন্যে জ্ঞান হারালেন।

জ্ঞান ফিরে দেখেন বিছানায় শুয়ে আছেন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও তরিকুল ইসলাম পাখা দিয়ে প্রাণপণে হাওয়া করছেন। তরিকুল ইসলামের পাশেই তাঁর স্ত্রী চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে।

ভদ্রমহিলার হাতে পানির গ্লাস। মাজেদি সর্বশক্তি দিয়ে পায়ের পাতায় তেল ঘসে যাচ্ছে। শুধু আয়নাকে কোথাও দেখা গেল না। মিসির আলি বললেন, খুবই বিব্রত বোধ করছি। আপনাদের সবাইকে হঠাৎ চিন্তার মধ্যে ফেলে দিলাম। এখন আমি ভালো আছি। খুবই ভালো।

তরিকুল ইসলাম বললেন, কোনো কথা বলবেন না। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করবে। ডাক্তার আনতে লোক গেছে। আপনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকুন। আপনি অজ্ঞান হয়ে আমার ঘাড়ে পড়লেন। কইলজাটা নড়ে গেল। ভেবেছি আপনি মারা গেছেন।

মিসির আলি লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন।

তরিকুল ইসলাম বললেন, মন্দের মধ্যে একটা ভালো খবর শুনেন নবীনগর থেকে পাবদা মাছ নিয়ে এসেছে। আগেই খবর দিয়ে রেখেছিলাম আজ এনেছে। খাওয়ার দরকার নাই এই মাছ চোখে দেখাও শান্তির ব্যাপার। এককেটা মাছের সাইজ বোয়াল মাছের কাছাকাছি। ঠিকমত রানতে পারব কি-না চিন্তায় অস্থীর হয়ে আছি।

তরিকুল ইসলাম সাহেবের স্ত্রী বললেন, মাছের কথা এখন বাদ থাকুক।

তরিকুল ইসলাম বললেন, বাদ থাকবে কি জন্যে? এত বড় পাবদা মাছ তুমি তোমার জন্মে দেখেছ? সেই মাছের গল্প করব না তো কি গল্প করব? তোমার বাপের বাড়ির গল্প করব? তোমার এক ভাই যে ঘুস খেয়ে জেলে গেছে সেই গল্পী?

এই সব কি কথা?

মিথ্যা বলেছি? মিথ্যা বললে মাটি খাই। আর যদি সত্যি বলে থাকি তুমি মাটি খাবে।

মিসির আলি চোখ বন্ধ করলেন। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে পড়াই উত্তম।

ঘরে মনে হয় আয়না ঢুকেছে। মিষ্টি স্ত্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। কদম ফুলের ঘ্রাণ। তরিকুল ইসলামের হৈচৈ থেমেছে। তাঁর স্ত্রী মনে হয় কাঁদছেন। কান্নার আওয়াজ আসছে।

আয়না বলল, বাবা-মা! তোমরা দু'জনই ঘর থেকে যাও। উনার ভালো ঘুম দরকার। আরাম করে কিছুক্ষণ ঘুমালেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে। আমি আছি। উনার পাশে। মাজেদি তুমিও যাও। পায়ে তেল ঘষতে হবে না। তুমি যেভাবে তেল ঘষছ মনে হচ্ছে পায়ের চামড়া ঘষে তুলে ফেলবে।

মিসির আলি চোখ মেললেন। তরিকুল ইসলাম তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেছেন। মাজেদ চলে যাচ্ছে। আয়ন দাঁড়িয়ে আছে। তাকে এখন ইন্দ্রানীর মতো লাগছে। আয়না বলল, স্যার আমি আপনার কপালে হাত রেখে বসে। থাকিব। আপনার ভালো লাগবে।

আয়না। কপালে হাত রাখল। কি ঠাণ্ডা হাত। ঘুমে মিসির আলির চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে তিনি অ্যালস্য ও আরামের আশ্চর্য এক জগতে ঢুকছেন।

স্যার।

বল আয়না।

আপনার ছাত্র এসেছে। খবর পেয়েছেন?

পেয়েছি।

আপনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন শুনে সে কি যে ভয় পেয়েছে। এ রকম ভয় শুধু পশুরাই পায়। মানুষ পায় না।

পশুরা মানুষের চেয়ে বেশি ভয় পায়?

জ্বি স্যার। ওরা ভয়ংকর এক ভয়ের জগতে বাস করে।

তুমি ওদের মনের কথা বুঝতে পার?

না। ওদের মনে ভয়ের বাইরে তেমন কোনো আবেগও অবশ্যি নেই। অনেক মানুষের মনের কথাও আমি ধরতে পারি না।

কি ধরনের মানুষ।

নিম্ন শ্রেণির মানুষ। ওরা পশুর মতই। স্যার আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

চোখ বন্ধ করে কথা বলতে আমার ভালো লাগছে।

তাহলে কথা বলুন।

তুমি কথা বল আমি শুনি।

আয়না বলল, আপনার ছাত্র প্রায়ই আমাকে বলত পৃথিবীটা মায়া ছাড়া কিছু না। পৃথিবী কি মায়া? আমাদের চারপাশে যা ঘটছে সবই মায়া?

মিসির আলি বললেন, সাধু সন্ন্যাসীরা এ রকম বলেন। এখন বিজ্ঞানীরাও বলছেন।

আয়না বলল, বুঝিয়ে বলবেন?

মিসির আলি বললেন, তুমি আমার মাথার কাছে বসে আছ। আমি পঞ্চ ইন্দ্রীয় দিয়ে তোমার উপস্থিতি বুঝতে পারছি। চোখ দিয়ে দেখছি, তোমার গলার স্বর শুনছি, স্ত্রাণ পাচ্ছি এবং স্পর্শ করেও জানিছি। আমার ব্রেইন পঞ্চ ইন্দ্রীয় থেকে আসা signal কে ব্যাখ্যা করছে তোমার উপস্থিতি হিসেবে। সব signal ই কিন্তু electrical.

আয়না বলল, ব্রেইন তো সিগন্যাল পাচ্ছে যে আমি আছি তাহলে আমি মায়া হব কেন?

মিসির আলি বললেন, তুমি স্বপ্ন দেখ না?

জি দেখি।

স্বপ্নেও ব্রেইন সিগন্যাল পায় বলেই দৃশ্য দেখে। আমরা কিন্তু স্বপ্নকে বলি মায়া।

হ্যাঁ বলি।

স্বপ্ন যদি মায়া হয় তাহলে জাগ্রত অবস্থায় যা দেখছি তাও মায়া। ঠিক না।

ঠিক।

আমরা পৃথিবী দেখি সাত রঙে। একটা গরু দেখে সাদাকালো। তাহলে তুমি বল আমাদের জগৎ কি রঙিন না। সাদাকালো?

আপনি কি বলতে চাচ্ছেন বুঝতে পারছি।

এখন এই দাঁড়াচ্ছে না রঙের ব্যাপারটাও মায়া।

জ্বি।

তুমি নিজেকে অতি রূপবতী হিসেবে মাঝে মাঝে দেখাও। ব্রেইনের ইলিকট্রিক সিগন্যাল প্রভাবিত করে এটা কর। সেটাও মায়া। তেমন রূপবতী তুমি না।

স্যার ঘুমিয়ে পড়ুন।

মিসির আলি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন। ডাক্তার চলে এসেছে। আয়না বলল, ডাক্তার সাহেব। আপনি অপেক্ষা করুন। বারান্দায় বসুন। চা খান। স্যার ঘুমাচ্ছেন। ঘুমের মধ্যে তাকে ডিসটার্ব না করাই ভালো।

মিসির আলি স্বপ্ন দেখছেন। স্বপ্নে আয়না মেয়েটি তার সঙ্গে কথা বলছে।

স্যার আপনি কি আমাকে চিনেছেন?

হ্যাঁ চিনেছি। তুমি আয়না!

আমি কোথায় থাকি জানেন?

এখানেই থাক।

না। আমি থাকি আয়নার ভেতর মাঝে মাঝে আয়না থেকে বের হয়ে আসি।

ভালতো।

হ্যাঁ খুব ভালো। আমি যখন আয়নার ভেতর থাকি তখন খুব ভালো থাকি। ভালো থাকাটা জরুরি। আর কিছুই জরুরি না। আমি একটা মায়া কা না নাস্তু?

হ্যাঁ। শুধু তুমি একা না, আমরা সবাই মায়া। একজন কেউ সেই মায়া তৈরি করেছেন।

স্যার কেন করেছেন?

আয়না আমি জানি না।

স্যার আমি এখন আয়নার ভেতর ঢুকে যাব। আর কেউ আমাকে পাবে না। আপনি ঘুমান।

মিসির আলি ঘুমুচ্ছেন। ঘুমের মধ্যে শুনছেন অনেক দূরে কোথাও অপূর্ব সংগীত হচ্ছে। এই সংগীত কি আয়নার ভেতর হচ্ছে?

মিসির আলির ঘুম পাতলা হয়ে এসেছে। তিনি এখন আছেন নিদ্রা এবং জাগরণের মাঝামাঝি। এই সময়টাও অদ্ভুত। তখন অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে।

কেকুল নামের এক বিজ্ঞানী এই সময় স্বপ্ন দেখলেন একটা সাপ বার বার তার লেজ কামড়ে ধরছে এবং ছেড়ে দিচ্ছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন কেউ একজন তাকে বেনজিনের রিং স্ট্রাকচার বুঝিয়ে দিচ্ছে। তাঁর ঘুম ভাঙ্গল তিনি কাগজে বেনজিনের স্ট্রাকচার লিখলেন।

আরেক রাশিয়ার বিজ্ঞানী স্বপ্নে পেলেন পেরিওডিক টেবিল।

মিসির আলিও কি কিছু পাবেন? তিনি অস্পষ্ট গলায় ডাকলেন, আয়না। আয়না।

স্যার আমি আপনার পাশেই আছি।

তুমি আমার ছাত্রকে খবর পাঠাও সে যেন চলে আসে। আয়না বলল, আমি তাকে খবর পাঠিয়েছি।

মিসির আলি বললেন, আমি তোমার রহস্যের সমাধান করতে চাচ্ছি।

তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে? আমি একা পারছি না।

আয়না বলল, স্যার আমি সাহায্য করব।

ডাক্তার একজন না। দু'জন এসেছেন। একজন এমবিবিএস ডাক্তার আরেকজন হোমিওপ্যাথ। তরিকুল ইসলাম জানালেন, কবিরাজ রোহিনী বাবুকে খবর পাঠানো হয়েছে। উনিও চলে আসবেন। ত্রিমুখী চিকিৎসা হবে।

তার প্রেসার মাপা হলো, সুগার মাপা হলো— সবই নরম্যাল।

মিসির আলি বললেন, আমি খুব ভাল আছি। হঠাৎ মাথা চক্কর দিয়ে উঠেছে। এর বেশি কিছু না। আপনারা ব্যস্ত হবেন না।

হবে। একবার যার মাথা চক্কর দিয়েছে- আরো একবার দিতে পারে। আপনারা বিশ্রাম করেন। খাওয়া দাওয়া করেন। এমন পাবদা মাছ খাওয়াব মৃত্যুর সময় মনে হবে পৃথিবীতে কি জিনিস খেয়েছি। একেকটা পাবদা বোয়াল মাছের চেয়েও বড়। আপনারা বলেন মারহাবা।

দুই ডাক্তারই আনন্দিত গলায় বললেন, মারহাবা।

৬. গরম চাদর গায়ে দিয়ে

রাত নটা।

মিসির আলি গরম চাদর গায়ে দিয়ে বারান্দায় বসেছেন। মাটির হাড়িতে তুষের আগুন করে তাঁর পায়ের কাছে রাখা হয়েছে যাতে তিনি পা গরম করতে পারেন। ফ্লাস্কে চা দেয়া হয়েছে। মিসির আলি পান খান না। তারপরেও পানের বাঁটায় পান দেয়া হয়েছে।

আয়না বসেছে তাঁর সামনে। সে গায়ে চাদর দেয় নি। সম্ভবত তার তেমন শীত লাগে না। আয়না বলল, স্যার একটা পান বানিয়ে দেই পান খান।

মিসির আলি বললেন, দাও।

আয়না পান বানাতে বানাতে বলল, আমাকে প্রশ্ন করলেই আমি উত্তর দেব। এইটুক সাহায্য আপনাকে করব। কিন্তু নিজ থেকে কিছু বলব না।

ঢুকে যাও এটা কি সত্যি?

জ্বি।

মিসির আলি বললেন, এটা সত্যি হবার কোনো কারণ নেই। আয়না জিনিসটা কি? এক খণ্ড গ্রাস যেখানে পারা লাগানো হয়েছে। যাতে আলো প্রতিফলিত হয়। তুমি সেখানে ঢুকতে পার না।

আয়না বলল, মার্থা মেয়েটা কি ভাবে ঢুকত?

মিসির আলি বললেন, মার্থার ব্যাপারটা আমার ছাত্র পুরোপুরি জানে না। কাজেই তুমিও জান না। এর মধ্যে অনেক মিথ্যা আছে। আমেরিকা ডিউক ইউনিভার্সিটির প্যারাসাইকোলজির প্রফেসর এরান সিমসন তাকে নিয়ে একটি বইও লিখেছেন। বইটার নাম Martha deceit. এই নামের সহজ বাংলা হচ্ছে মার্থা বিষয়ক ধাপ্পাবাজি। বইটা আমার কাছে আছে। তুমি পড়ে দেখতে পার।

আয়না বলল, মার্থা মিথ্যা করে বলেছে সে আয়নার ভেতর থাকে।

মিসির আলি বললেন, সে নিতান্তই বাচ্চা একটা মেয়ে। বাচ্চারা কল্পনার জগতে বাস করে। সে কল্পনা করেছে।

স্যার আমি তো বাচ্চা মেয়ে না।

মিসির আলি বললেন, বড়রাও কল্পনা করে। সিজিওফ্রেনিক রোগীরা শুধু যে কল্পনা করে তা-না। তারা সেই জগতে বাসও করে। এখন আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, মাঝে মাঝেই তুমি ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দুই তিন দিন কাটিয়ে দাও। তখন কি করা?

আয়না বলল, আমি কিছু করি না। আয়নার ভেতর ঢুকে পড়ি। ঐ জগতে থাকি।

ধরে নিলাম তুমি আয়নার জগতে থাক। বের হয়ে আসা কেন?

স্যার আমি নিজের ইচ্ছায় আয়নায় ঢুকতেও পারি না। বের হতেও পারি না। ঘটনোটা আপনা। আপনি ঘটে। আমি যদি নিজের ইচ্ছায় ঢুকতে পারতাম তাহলে কারো সামনে ডুকতাম না। কাউকে ভয় দেখাতাম না।

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। আয়না বলল, স্যার প্রশ্ন করুন।

তুমি যে তরিকুল ইসলাম সাহেবের পালক মেয়ে এটা নিশ্চয় তুমি জান?

জ্বি জানি।

তোমার আসল বাবা-মাদের বিষয়ে জান না?

জানি না।

তারা এই পৃথিবীর মানুষ না-কি আয়না জগতের মানুষ।

আয়না জগতের মানুষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

মিসির আলি বললেন, আয়না জগতটা কেমন?

আয়না বলল, কেমন বলতে পারব না, যখন আপনাদের সঙ্গে থাকি তখন আয়না জগতের কথা তেমন মনে থাকে না। সেই জগৎটা ছায়া ছায়া, শান্তির জগৎ। মনে হয়। সেখানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই। সেখানে সবাই একা থাকে।

একা থাকে?

জ্বি একা থাকে। এটা মনে আছে। স্যার একটা কাজ করুন না। আপনি আমাকে হিপনোটিক সাজেশন দিয়ে আয়না জগতে নিয়ে যেতে পারেন কি-না দেখুন। আপনি মনে মনে এই কথা ভাবছেন বলেই বললাম।

মানুষের মনের কথা কি তুমি ধরতে পারতে?

প্রথম যখন আয়না জগতে যাই এবং সেখান থেকে বের হয়ে আসি তখন থেকে পারি। আয়না জগতের সবাইতো একা একা থাকে। এই ভাবেই একজনের সঙ্গে অন্যজন যোগাযোগ করে। মানুষ এক সঙ্গে থাকে বলেই এমন ক্ষমতার তাদের প্রয়োজন হয় নি। তাছাড়া এই জগতে মোবাইল ফোনও আছে।

মিসির আলি মাটির হাড়ির উপর পা রাখলেন। রাত বাড়ার সঙ্গে শীত বাড়ছে। পা ঠাণ্ড হয়ে আসছে। আয়না বলল, বোতলে গরম পানি ভরা আছে। একটা বোতল এনে দেব কোলে রাখবেন?

দরকার নাই।

স্যার আরো কোনো প্রশ্ন করবেন?

মিসির আলি বললেন, কোন লাইনে প্রশ্ন করব ধরতে পারছি না। তোমাকে প্রশ্ন করার দুটি লাইন আছে। প্রথম লাইনে তুমি Delusion এর স্বীকার। অসুস্থ একটা মেয়ে। যে নিজের জন্যে ভ্রান্তির এক জগৎ তৈরি করেছে। সে তাঁর ভ্রান্তির জগতে বাস করে।

পৃথিবীর Realityর সঙ্গে যে যুক্ত না। কিছু ড্রাগস আছে। এ ধরনের জগৎ তৈরি করে। যেমন—L S D.

আর দ্বিতীয় লাইন হচ্ছে স্বীকার করে নেয়া তুমি সত্যি সত্যি আয়না জগতের বাসিন্দা। সেখানেই থাক। মাঝে মাঝে সেখান থেকে বের হয়ে অ্যাস। আমার সমস্যা হচ্ছে। আমি কোনটাই গ্রহণ করতে পারছি না। অন্ধকারে ঢ়িল ছোড়া আমার স্টাইল না। আমি লজিক ব্যবহার করি। লজিক পাশা খেলা না। লজিক অন্ধকারে ঢ়িল ছুড়ে না। আমি আজ রাতটা চিন্তা করব। কাল আরো কিছু প্রশ্ন করব। আমার ছাত্রও তখন সঙ্গে থাকবে।

হিপনোটাইজ করবেন না?

করব। তোমাকে এবং আমার ছাত্রকে এক সঙ্গে করার চেষ্টা করব।

স্যার আজকের অধিবেশনের কি এখানেই সমাপ্তি?

হুঁ।

আমি কি চলে যাব?

চলে যাও।

আপনি এখানেই থাকবেন?

হ্যাঁ। শীতের মধ্যে বসে থাকতে ভাল লাগছে। তোমাদের বারান্দাটা সুন্দর। ঢাকায় যখন চলে যাব তখন বারান্দাটা মিস করব।

আয়না বলল, স্যার আরেকটা সিগারেট ধরান। সিগারেট শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনার সঙ্গে থাকি। আপনার গল্প শুনি।

কি গল্প শুনবে?

যে কোনো গল্প।

রূপকথা?

বলুন। আপনার রূপকথা সাধারণ রূপকথা হবে না। এর মধ্যেও অন্য কিছু থাকবে।

মিসির আলি বললেন, Delusion এর জগৎ নিয়ে কথা বলি। মানব জাতির একটা অংশ সব সময়ই ডিলিউসনের জগতে বাস করে। এদের মধ্যে বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট আছেন, সংগীতজ্ঞ আছেন। লেখক, চিত্রকর আছেন। কাজেই তুমি ভেব না যে তুমি একা এবং অদ্বিতীয়।

স্যার আমি ভাবছি না।

আবার একদল আছে যারা অন্যের ভেতর কঠিনভাবে ভ্রান্তি ঢুকিয়ে দেয়। এর সবচে বড়। উদাহরণ হলো পারস্যের হাসান সাকবা। এই হাসান সাব্বা পাহাড় ঘেরা এক সমতল ভূমিতে গোপন বেহেশত তৈরি করেছিল। সেই বেহেশতে অপূর্ব বাগান ছিল। দুধ, মধু

এবং শরাবের নাহর ছিল। ষোল সতেরো বছরের অতি রূপবতী নগ্ন যুবতীরা ছিল। হাসান সাব্বা তার কিছু নির্বাচিত শিষ্যদের এই বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। তবে বেহেশতে ঢোকার আগে তাদের হেলুসিনোজেটিং ড্রাগ হাশিশ। অর্থাৎ ভাংএর শরবত খাওয়ানো হতো। শিষ্যরা পুরোপুরি এক ভ্রান্তির জগতে চলে যেতো। হাসান সাকবা পরে এদের দিয়েই গোপন হত্যাকাণ্ড ঘটাতেন। হাশিশা থেকে আরবী হালাশিন। সেখান থেকে ইংরেজি শব্দ এসেছে Assassin . অর্থাৎ গুপ্ত ঘাতক।

এই দলটিকে ধ্বংস করার অনেক চেষ্টা করা হয়। কেউ পারে নি। অনেক পরে মোঙ্গল নেতা হালাকু খান তাদেরকে পুরোপুরি ধ্বংস করেছিলেন।

গল্প শেষ করে মিসির আলি হাসলেন। আয়না বিস্মিত হয়ে বলল, স্যার হাসছেন কেন?

মিসির আলি বললেন, তোমাকে ভ্রান্তির জগৎ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যে একজন হালাকু খাঁ দরকার। আমি হালাকু খাঁ না। আমি বৃদ্ধ মিসির আলি।

৭. ঘুম ভাঙ্গে ফজরের ওয়াক্তে

তরিকুল ইসলামের ঘুম ভাঙ্গে ফজরের ওয়াক্তে। তিনি হিমশীতল ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করে নামাজ আদায় করেন। এরপর তার আর অনেকক্ষণ কিছুই করার থাকে না। বাড়ির সবাই ঘুমে। তাদের ঘুম এত সহজে ভাঙে না। তরিকুল ইসলাম ঝাড়ু হাতে নেন। উঠান ঝাড় দেয়া শুরু করেন। এতে দুটা কাজ হয়- উঠান হয় ঝকঝকে পরিষ্কার এবং তাঁর শীত কমে। কিছু এক্সসারসাইজও হয়। এই বয়সেও এক্সসারসাইজ করে শরীর ঠিক রাখা অত্যন্ত জরুরি।

একটা বিষয় চিন্তা করে তরিকুল ইসলাম বেশ মজা পান। বিষয়টা হচ্ছে বাড়ির কেউই উঠান বাট দেয়ার ব্যাপারটা জানে না। তারা ধরেই নিয়েছে ঘুম থেকে উঠে দেখবে চারদিক ঝকঝকি করছে। কারো মনে কোনো প্রশ্ন নেই।

তরিকুল ইসলাম উঠান ঝাঁট দিচ্ছেন। অর্ধেকের মতো ঝাঁট দেয়া হয়েছে। হঠাৎ পেছন থেকে এসে কে যেন তার হাত ঝাণ্টে ধরল এবং ঝাড়ু দূরে ছুড়ে ফেলে দিল। তিনি চমকে পেছনে ফিরে আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলেন। জামাই ফারুক এসেছে। তরিকুল ইসলাম বললেন, বাবা! কেমন আছ?

ফারুক কদমবুসি করতে করতে বলল, আপনি ঝাঁট দিচ্ছেন কেন? বাড়িতে মানুষ নাই?

তরিকুল ইসলাম বললেন, ঝাড়ু দেয়া মানে একই সঙ্গে হাতের, পায়ের এবং কোমড়ের এক্সসারসাইজ। এই জন্যে ঝাড়ু দেই।

ফারুক বলল, এক্সসারসাইজের জন্যে ঝাড়ু দিতে হবে না। আপনি ফ্রি হ্যান্ড এক্সসারসাইজ করবেন। বাবা এখন বলুন আমার স্যারের অবস্থা কি? উনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন শুনে কি যে ভয় পেয়েছিলাম।

তোমার স্যার ভালো আছেন। ডাক্তার দেখে গেছে বলেছে কোনো ভয় নাই। উনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে মসজিদে একটা মিলাদও দিয়েছি। কবিরাজ রোহিনী বাবু এসেছিলেন তিনি চীবন প্রাস বানিয়ে দিয়েছেন। সকাল বিকাল এক চামচ করে খেলে ঘোড়ার মতো তেজি শরীর হবে।

স্যার কি ঘুমাচ্ছেন?

সবাই ঘুমাচ্ছে। কখন যে উঠবে আল্লাহ পাক জানে। দাঁড়াও ডেকে তুলি।

কে চা বানাবে?

আমি বানাব। আপনার জন্যে ইলিশ মিষ্টি নিয়ে এসেছি।

ইলিশ মিষ্টিটা কি?

সন্দেশ। ইলিশের পেটির মতো করে বানানো।

তরিকুল ইসলাম আগ্রহের সঙ্গে বললেন, বের কর একটা খেয়ে দেখি। ভালো মিষ্টি দেশ থেকে উঠেই যাচ্ছে। নাটোরের কাচাগোল্লা এখন স্মৃতি ছাড়া কিছুই না। মেট্রিক পরীক্ষার আগের দিন নাটোরের কাঁচাগোল্লা খেয়েছিলাম। সেই স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে। হাতে

লেগে আছে মিষ্টির গন্ধ। তোমরা এই জমানার ছেলে।পুলে আসল মিষ্টির স্বাদ কিছুই জানলে না। আফসোস, বিরাট আফসোস।

উঠানে বেতের মোড়ায় স্বশুর জামাই চা খাচ্ছেন। তিরিকুল ইসলাম আনন্দে অভিভূত। জামাইকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন। তাঁরকুল ইসলাম বললেন, দুপুরে মাছ কি খেতে চাও বল।

ফারুক বলল, বিলের ফ্রেস ছোট মাছ খাব।

পাঁচমিশালী গুড়ামাছ জোগার করব। কোনো সমস্যা নাই।

কালি বোয়াল কি পাওয়া যায় বাবা?

এইতো বিপদে ফেললে এইসব জিনিস কি আর দেশে আছে? দেখি চেষ্টা করে।

খলিসা মাছ?

আরেক ঝামেলায় ফেলেছ। খলিসাতো প্রায় extinct মাছ। এখুনি বের হচ্ছি। সকাল সকাল না গেলে পাওয়া যাবে না।

ফারুক বলল, বাবা আপনার জন্যে একটা চাদর এনেছিলাম। বের করে দেই? চাদরটা গায়ে দেন। দেব?

দাও।

তরিকুল ইসলাম গায়ে চাদর জড়াতে জড়াতে বললেন, আরেক কাপ চা বানাওঁ। চা খেয়ে বের হই। আরেকটা কথা বাবা তোমাকে বলি মন দিয়ে শোন। আমি শিক্ষক মানুষ তো সব মানুষকে আমার কাছে মনে হয়। পরীক্ষার খাতা। সবাইকে নম্বর দেই! তুমি আমার কাছে নম্বর পেয়েছ একশতে একানব্বই। সন্টার মার্কের চেয়েও বেশি। আর আমার জার্মান প্রবাসী গাধা পুত্র পেয়েছে চব্বিশ। গ্রেস মার্ক দিয়েও তাকে পাস করানোর বুদ্ধি নেই।

ফারুক বলল, আয়না। আয়না কত পেয়েছে?

তরিকুল ইসলাম চিন্তিত গলায় বললেন, ওর খাতাটা আমি বুঝি না। নাম্বারাও এই জন্যে দিতে পারি না।

আয়না দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। তার দৃষ্টি উঠোনের দিকে। শ্বশুর জামাই চা খেতে খেতে গল্প করছে দেখতে ভালো লাগছিল। এখন ফারুক একা। মাথা নিচু করে উঠোনে হাঁটছে। একবারও দোতলার দিকে তাকাচ্ছে না। তাকালেই আয়নার হাসি মুখ দেখতো।

আয়না দোতলা থেকে নামল। তার কেন জানি হঠাৎ ইচ্ছা করছে ফারুককে চমকে দিতে। নিঃশব্দে তার পেছনে দাঁড়িয়ে হাউ' করে চিৎকার দিলে কেমন হয়? আয়না খানিকটা অবাক হচ্ছে। এ রকম ইচ্ছাতো তার আগে কখনো হয় নি।

হাউ চিৎকার শুনে ফারুক চমকে তাকালো। আয়না গম্ভীর গলায় বলল, কেমন আছ?

ভালো আছি। তুমি কেমন আছ?

আমিও ভালো আছি। তোমার শিক্ষকও ভালো আছেন। তবে তাঁর মাথা খানিকটা এলোমেলো।

ফারুক বলল, আমার স্যার এমন একজন মানুষ যার মাথা কখনো এলেমেলো হয় না।

তাই বুঝি?

ফারুক বলল, হ্যাঁ তাই—
যদিও আমার গুরু শুড়ি বাড়ি যায়
তবুও আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।

আয়না বলল, শুড়ি বাড়ি যায় মানে?

ফারুক বলল, কথার কথা বললাম, আমার গুরু কোথাও যান না।

আয়না বলল, দোতলা থেকে দেখলাম তুমি বাবার জন্যে চা বানিয়ে এনেছি। আমার জন্যে চা বানিয়ে আন।

এখুনি আনছি। ইলিশ সন্দেশ এনেছি। খাবে?

তুমি বললে খাব। সকালে আমি মিষ্টি খাই না। খেতে বলো না।

আচ্ছা বলব না।

আমি চা খাব আর তুমি আমার সামনে বসে বলবে কেন তুমি মিসির আলি নামের মানুষটাকে এত পছন্দ কর?

ফারুক বলল, আচ্ছা যাও বলব।

আয়না বলল, আমিও পছন্দ করি তবে আমার পছন্দের কারণ আর তোমার পছন্দের কারণ এক না।

তোমার পছন্দের কারণ কি?

আয়না। হাসতে হাসতে বলল, বলব না।

ফারুক চা বানিয়ে এনেছে। আয়না আগ্রহ করে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। ফারুক বলল, মিসির আলি স্যারকে এত পছন্দ করি কেন বলছি। মন দিয়ে শোন।

মন দিয়ে শুনছি।

তাঁর চিন্তা করার ধারা বা বুদ্ধিবৃত্তির বিন্যাস বাদ থাকুক মানুষ মিসির আলির একটা গল্প শোনা। মন দিয়ে শোন।

বাr বার মন দিয়ে শোনা বলছ কেন? আমি যা শুনি মন দিয়ে শুনি।

একদিন ক্লাসে তিনি বললেন, আমি মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তার চিন্তা করার ক্ষমতার ভেতর একটা সম্পর্ক বের করার চেষ্টা করছি। তোমরা হচ্ছে আমার প্রথম সাবজেক্ট। তোমরা সবাই তোমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করবে এবং বোর্ডে লেখা পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর দেবে।

১. রাতে বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে যাও না বাতি জ্বালিয়ে ঘুমুতে যাও?

২. উচ্চতা ভীতি কি আছে?

৩. দিঘির পানির কাছে গেলে কি পানিতে নামতে ইচ্ছা করে?

আগুন ভয় পাও?
৫. অপরিচিত কোনো ফুল হাতে পেলে গন্ধ শুঁকে দেখ?

আমরা সবাই আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা লিখলাম এবং আগ্রহ নিয়ে প্রশ্নগুলির জবাব দিলাম। কাজটা স্যার কেন করলেন জন? আমাদের মধ্যে হতদরিদ্র যারা তাদের খুঁজে বের করার জন্যে।

আয়না বলল, মজার তো।

ফারুক বলল, স্যার তিনজন হতদরিদ্র খুঁজে বের করলেন যাদের ইউনিভার্সিটির খরচ তিনি দিতেন। আমি ছিলাম তিন জনের একজন।

বাহ্।

আরেকটা গল্প বলব?

বল।

স্যারের একবার প্লুরিসি হলো। খুবই খারাপ অবস্থা। তিনি এমন একটা ক্লিনিক বের করলেন যার খোজ কেউ জানে না। তিনি সেখানে ভর্তি হলেন। কেন জান?

কেন?

যাতে ছাত্ররা তাঁকে খুজে না পায়। তাকে সেবার জন্যে ব্যস্ত না হয়। তিনি কারোর সেবা নেন না। মিসির আলি স্যার এমনই একজন পূণ্যবান ব্যাক্তি যার কাছাকাছি বসে থাকলেও পূণ্য হয়।

আয়না বলল, তোমার চোখে পানি এসে গেছে। পানি মোছ।

ফারুক চোখ মুছল।

মিসির আলির সঙ্গে ফারুকের দেখা হল সকালে নাশতার টেবিলে। ফারুক বলল, স্যার আমাকে চিনেছেন?

মিসির আলি বললেন, তোমার নাম দেখে তোমাকে চিনতে পারি নি। এখন চিনেছি। খুব ভালো মত চিনেছি। তুমি অনার্স এবং এমএ দুটোতেই ফাস্টক্লাস ফাস্ট হয়েছিলে। ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হবার কথা ছিল। কি সব পলিটিক্সের কারণে হয়নি।

ফারুক বলল, আমার বিষয় আর কিছু কি মনে আছে স্যার?

মনে আছে। আমার একবার প্লুরিসি হয়েছিল। মারতে বসেছিলাম। ভর্তি হয়েছিলাম। এমন এক ক্লিনিকে যার খোজ কেউ জানে না। তুমি কি ভাবে কি ভাবে সেখানে উপস্থিত হলে। কেমন আছ ফারুক?

স্যার ভালো আছি। আপনি সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন দেখে ভালো লাগছে।

মিসির আলি বললেন, তুমি যে ডেকেছি সেই সমাধান আমি করতে পারিনি। পারব সে রকম মনে হচ্ছে না।

ফারুক বলল, সব সমস্যার সমধান থাকে না। স্যার। যেসব সমস্যার সমাধানই নেই আপনি তার কি সমাধান করবেন? এইসব নিয়ে আমরা রাতে কথা বলব।

৮. বঙ্গোপসাগরে ডিপ্রেসন

মনে হয় বঙ্গোপসাগরে ডিপ্রেসন হয়েছে। দুপুর থেকে আকাশে মেঘা জমতে শুরু করেছে। সন্ধ্যার পর থেকে টিপটপ বৃষ্টি, ঝড়ো বাতাস। তাঁরকুল ইসলাম আনন্দিত— ঝড় বৃষ্টি উপলক্ষে বিশেষ কিছু রান্না হবে। খিচুড়ি, ঝাল গরুর মাংস। ময়মনসিংহে BT ট্রেনিংয়ের সময় তিনি গরুর মাংস রান্নার একটা পদ্ধতি শিখেছিলেন। সেটা করবেন কি-না বুঝতে পারছেন না। মাটির হাঁড়িতে মাংস, লবণ সামান্য তেল এবং এক গাদা কাচামরিচ দিয়ে অল্প আঁচে জ্বাল দেয়া। অন্য সব মসলা নিষিদ্ধ। মাংসের বিশেষ যে গন্ধ আছে, কাচামরিচ সেই গন্ধ নষ্ট করবে। আলাদা ফ্লেভার নিয়ে আসবে।। তিনি নিজেই গরুর মাংস আনতে গেলেন। গ্রামে কসাই-এর কোনো স্থায়ী দোকান নেই। শুধু হাটবারে মাংস বিক্রি হয়। সৌভাগ্যক্রমে আজ হাটবার।

বাড়িতে মেহমান শুধু না, জামাইও উপস্থিত। বিশেষ বিশেষ রান্নার অতি উপযুক্ত উপলক্ষ।

মিসির আলি নিজের ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করে বসে আছেন। তিনি খাটে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছেন। তার পায়ের উপর কম্বল। তার সামনে বসেছে আয়না এবং ফারুক। এরা দু'জন বসেছে খাটের শেষ প্রান্তে। সোলার লাইট কাজ করছে না। মেঘলা দিন ছিল বলেই প্যানেল চার্জ হয়নি। ঘরে হরিকেন জ্বলছে। টেবিলে দেয়াশলাই এবং মোমবাতি রাখা আছে।

ফারুক বলল, স্নাতটা ভূতের গল্পের জন্যে অসাধারণ। স্যার আমি অতিথিপুর রেলস্টেশনে একবার একটা ভূত দেখেছিলাম। এই গল্পটা বলব? ভূত সাধারণত মানুষের সাইজের কিংবা মানুষের চেয়ে লম্বা হয়। এই ভূতটা বামণ। ছয় সাত বছরের ছেলের হাইট।

মিসির আলি বললেন, ভূতের গল্প থাকুক। তুমি বরং আয়নার গল্প শোনাও। তুমি একজন সাইকোলজিস্ট। তোমার চোখে আয়না মেয়েটি কি? তুমি তার অদ্ভুত কর্মকাণ্ডের নিশ্চয়ই কোনো ব্যাখ্যাও দাঁড়া করিয়েছ। সেই ব্যাখ্যাও শুনি। আয়নার কি আপত্তি আছে?

আয়না মুখে কিছু বলল না। তবে মাথা নাড়িয়ে জানালো তার আপত্তি নেই।

মিসির আলি তার ছাত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার সামনে সিগারেট খেতে কোনো বাধা নেই। সিগারেট ধরাও। আমি দেখলাম সিগারেটের খোঁজে পকেটে হাত দিয়ে চট করে হাত বের করে নিয়েছ তাই বললাম।

ফারুক বলল, আমার সিগারেট লাগবে না। আপনার কথায় হঠাৎ টেনশান তৈরি হয়েছিল বলে সিগারেটের প্যাকেটে হাত দিয়েছিলাম। স্যার আয়না বিষয়ে আমার যা বলার তা ডায়েরিতে লিখেছি। এর বাইরে তেমন কিছু নেই।

মিসির আলি বললেন, আয়না এবং তুমি তোমরা দু'জনই ডিলিউসনে ভূগছ এমন কি কখনো মনে হয়েছে?

জ্বি স্যার হয়েছে। শুরুতে আমি নিজেকেই। Delusion এর Patient ভেবেছি! এক সময় নিশ্চিত হয়েছি সমস্যা আমার না।

কি ভাবে নিশ্চিত হয়েছ?

ফারুক বলল, আঙুর মেয়েটা যখন দেখল তার আপ ঢুকে পড়ছে আয়নার ভেতরে তখন আঙুর নিতান্তই বাচ্চা মেয়ে। সে এমন একটা ঘটনা বানিয়ে বলবে না।

মিসির আলি বললেন, তোমার স্ত্রীর মানসিক ক্ষমতা প্রবল। সে তার ক্ষমতা দিয়ে আঙুর মেয়েটিকে প্রভাবিত করতে পারে। এমন এক illusion তৈরি করতে পারে যাতে আঙুরের ধারণা হবে তাঁর আপা আয়নার ভেতর ঢুকে গেছে।

ফারুক বলল, আয়না এই কাজ কখনো করবে না। সে আঙুরকে খুব পছন্দ করে। সে তাকে পালক পর্যন্ত নিতে চেয়েছে। মেয়েটা ভয় পায় এমন কিছু সে করবে না।

মিসির আলি বললেন, আয়নার ঘরে ভিডিও ক্যামেরা বসানোর কথা কখনো ভেবেছ? CCTV. সারাক্ষণ এই টিভি চলবে। আয়নার প্রতিটি কর্মকাণ্ডের রেকর্ড থাকবে। আয়নার ভেতর ঢুকুল কি ঢুকাল না জানা যাবে।

ফারুক বলল, এটা মাথায় আসে। নি। স্যার এখন আমি একটা সিগারেট ধরাব। হঠাৎ টেনশান বোধ করছি।

মিসির আলি বললেন, সিপারেট ধরাও। একটা বড় আয়না নিয়ে আস। আয়নাটা ব্যবহার করে আমি হিপনোটিক সাজেশন দেব। তোমাদের দু'জনকেই দেব। আয়না রাজি আছে। ফারুক! তুমিও নিশ্চয়ই রাজি।

ফারুক বলল, আপনি যা করতে বলবেন, আমি করব। আমি আয়না নিয়ে আসছি।

ফারুক আয়না আনতে গেল। মিসির আলি নিজেও একটা সিগারেট ধরালেন। আয়না বলল, চা খাবেন স্যার?

মিসির আলি বললেন, ঘন ঘন চা খাবার অভ্যাস আমার নেই। তোমার পাল্লায় পড়ে চা খাওয়ার অভ্যাস হয়েছে, পান খাওয়ার অভ্যাস হয়েছে। এখন চা পান কোনোটাই না। তুমি আমাকে এক পিস সাদা কাগজ এবং কলম দাও।

ফারুক আয়না নিয়ে এসেছে। মিসির আলি আয়নাটা তাদের দিকে ধরেছেন। তিনি বসেছেন আয়নার পেছনে। ফারুক বলল, স্যার কেন জানি আমার ভয় ভয় লাগছে।

মিসির আলি বললেন, এই কাগজ এবং কলম নাও! কাগজে লেখ, আমার ভয় ভয় লাগছে। উল্টো করে লিখবে। তোমার ডায়েরিতে তুমি যেমন উল্টো করে লিখেছি সে রকম। তোমার লেখা শেষ হবে। আর হিপনোটিক সাজেশন শুরু হবে।

ফারুক লিখছে— তার সময় লাগছে। আয়না আগ্রহ নিয়ে ফারুকের লেখা দেখছে, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে ফারুকের দিকে। মিসির আলি বললেন, ফারুক তোমার কি Dyslexia আছে? যেখানে মানুষ উল্টো করে লেখে?

ফারুক বলল, জি না স্যার।

মিসির আলি বললেন, ব্যাপারটা খুব আশ্চর্যের না? তুমি পুরো একটা চ্যাপ্টার উল্টো করে লিখেছি। নির্ভুল ভাবে লিখেছি আর এখন একটা বাক্য লিখতে পারছি না। তোমার কপাল ঘামছে।

ফারুক কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, স্যার একটা সিগারেট খাব ।

খাও। একবার অনুমতি দিয়ে দিয়েছি— বার বার অনুমতি চাইতে হবে না। লেখা শেষ?

জ্বি না। লেখা উল্টো হয়েছে কিন্তু মিরর ইমেজ হয় নি।

বাদ দাও পরে লিখবো। সিগারেট শেষ করে- আমরা হোপনোসিস শুরু করব। আয়নাকে নিয়ে আমি এখন। তিনটা হাইপোথিসিস দাঁড়া করিয়েছি। এক এক করে বলি—

হাইপোথিসিস-A

এখানে আমি ধরে নিচ্ছি। আয়নার ভেতর ঢুকে পড়ার অস্বাভাবিক ক্ষমতা এই মেয়েটির আছে! এই হাইপোথিসিসের পেছনে আছে মেয়েটির নিজের স্বীকারোক্তি। ফারুকের বক্তব্য এবং আঙ্গুর মেয়েটির বক্তব্য। বিজ্ঞান এই হাইপোথিসিস অগ্রাহ্য করবে। আমি নিজেও অগ্রাহ্য করছি। তারপরেও হাইপোথিস দাঁড়া করানো হ'ল। ভুলের ভেতর দিয়ে শুদ্ধকে খোঁজার নিয়ম আছে।

হাইপোথিসিস-B

হাইপোথিসিস বলছে- আয়নার ভেতর কেউ কখনো ঢুকেনি। এক Reality থেকে অন্য Reality তে যেতে হলে আয়না লাগে না। বিছানায় শুয়ে শুয়েও একজন মানুষ Reality বদলাতে পারে। বিজ্ঞান এই হাইপোথিসিস সমর্থন করবে।

হাইপোথিসিস-C

এই হাইপোথিসিস বলছে পুরো ব্যাপারটাই আয়নার স্বামী ফারুকের কল্পনা। যে সাইকোলজির ছাত্র। Delusion এর বিষয়টা সে জানে। আয়না তার Delusion এ সাহায্য করেছে। মার্থ নামের এক বাচন মেয়ে বলতো সে আয়না জগতে বাস করে। মার্থার কাহিনী ফারুকের Delusion কে ট্রিগার করেছে। তার স্ত্রীর আয়না প্রীতি তাকে সাহায্য করেছে। তার স্ত্রীর নামও আয়না। সব কিছুই তাকে সাহায্য করেছে।

আয়না রাতে তার স্বামীর সঙ্গে ঘুমায় না। এটিও ফারুকের Delusion এর অংশ। ফারুক চায় না তার সঙ্গে স্ত্রীর রাত্রি যাপন করতে।

মিসির আলিকে থামিয়ে দিয়ে ফারুক বলল, স্যার আমি কেন চাইব না?

মিসির আলি বললেন, তুমি নারী বিদ্বেষী পুরুষদের একজন। বিয়ের আগে তোমার ইচ্ছা হয়নি যে মেয়েটিকে বিয়ে করবে তাকে দেখতে বা তার ছবি দেখতে। বিয়ের পরেও দীর্ঘ সময় তাকে এই বাড়িতে ফেলে রেখেছ। নিজের কাছে নিয়ে যাও নি।

ফারুক বলল, স্যার কোয়ার্টার পাচ্ছিলাম না।

মিসির আলি বললেন, আগ্রহ থাকলে তুমি বাড়ি ভাড়া করতে। মেয়েটির সঙ্গে তুমি বাস করতে চাও না। আবার তাকে পুরোপুরি ছেড়েও দিতে চাও না।

ফারুক বলল, স্যার একটা জিনিস আপনার বুঝতে হবে- আয়নার অসাধারণ সাইকিক ক্ষমতার বিষয়টি আপনি জানেন। এ রকম একজন মহিলার সঙ্গে বাস করা অসম্ভব।

মিসির আলি বললেন, তুমি সাইকোলজির ছাত্র। একজন সাইকোলজির ছাত্রের সাইকিক ক্ষমতাধর স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের বিষয়। হয়ে গেল উল্টা।

ফারুক বলল, স্যার আয়না নিজেই কিন্তু বলছে সে আয়নার ভেতর ঢুকে যায়।

মিসির আলি বললেন, সে আদর্শ স্ত্রী'র মতো আচরণ করেছে। স্বামী যা চাচ্ছে তাই বলছে। সাইকোলজির ভাষায় এই ধরনের আচরণের একটা নাম আছে একে বলে Sympathetic delusion.

ফারুক বলল, এই হাইপোথিসিসটাকেই কি আপনি সমর্থন করছেন?

মিসির আলি বললেন, না। আমার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা। এসো হিপনেটিজম শুরু হোক। ফারুক তুমি যদি আরেকটা সিগারেট খেতে চাও খেয়ে নাও। চোখ মুখ শক্ত করে রাখার কিছুই নেই। স্বাভাবিক হও। তোমাকে হিপনোটিক Trance এর ভেতর দিয়ে যেতে হবে না। তুমি একজন Observer.

ফারুক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আয়না স্বাভাবিক আছে। তার চোখে কৌতূহল। মিসির আলি বললেন, আয়না! আমি শুরু করব?

শুরু করুন।

আমি তোমাকে যা করতে বলব তুমি করবে। আমার উপর এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে আমি তোমার ক্ষতি করব না। তোমার অমঙ্গল হয় এমন কিছু করব না।

স্যার এই বিশ্বাস আমার আছে।

এখন তাকাও আমার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি আয়না জগতে ঢুকে যাবে। সেই জগৎ তোমার জন্যে আনন্দময়। সেখানে ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই। ছায়া ছায়া অস্পষ্ট এক জগৎ। তুমি কি তৈরি?

জ্বি।

আয়না জগতে ঢুকে যাবার পর তোমাকে আমি প্রশ্ন করব তুমি উত্তর দেবে। সব প্রশ্নের উত্তর যে দিতে হবে তা-না। তুমি যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে না চাও দেবে না।

মিসির আলি কাগজ কলম হাতে নিলেন। কাগজে লিখলেন- নদী, পাখি, ফুল। কাগজটা বলের মতো গুটি পাকিয়ে আয়নার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

আয়না। এই বলটা হাতের মুঠির মধ্যে নাও। এখন তুমি যাত্রা শুরু করেছ। আয়না জগতের দিকে। জগতটা মাটির নিচে। সিঁড়ি বানানো আছে। তুমি একেকটা সিঁড়ি পার হবে। আর আয়না জগতের কাছাকাছি যেতে থাকবে। তোমার এখন ঘুম পাচ্ছে। আয়না ঘুম পাচ্ছে?

পাচ্ছে।

প্রথম সিঁড়ি পার হলে। এইত দ্বিতীয় সিঁড়ি। আয়না! ঘুম পেলে চোখ বন্ধ করে ফেল।

আয়না চোখ বন্ধ করল। মিসির আলি বললেন, একটা সময় আমি বলব আয়না চলে এসো। তুমি আয়না জগত ছেড়ে চলে আসবে। আয়না শুনতে পাচ্ছ?

হুঁ।

তুমি তৃতীয় সিঁড়ি পার হয়েছ। এখন পার হলে চতুর্থ সিঁড়ি। আর একটা ধাপ শুধু বাকি। এই ধাপটা পার হলেই তুমি আয়না জগতে। তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

অস্পষ্ট।

আয়না বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। সামান্য দুলছে। ফারুক নিজেও বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। সেও দুলছে। মিসির আলি নিশ্চিত আয়না জগতে আয়না একা ঢুকবে না। ফারুক নিজেও ঢুকে যাবে।

আয়না!

হুঁ।

এখন শেষ ধাপ পার হও। আয়না জগতে ঢুকে যাও।

আয়না দুলুনি বন্ধ করে স্থির হয়ে গেল। মিসির আলি ফারুকের দিকে তাকালেন। সেও মূর্তির মতো স্থির হয়ে আছে। মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। হাতে সময় আছে। তাড়াহুড়ার কিছু নেই।

আয়না আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি।

তুমি কোথায়?

আয়না জগতে।

তুমি একা না। আরো কেউ আছে তোমার সঙ্গে?

ও আছে।

ফারুক যে তোমার সঙ্গে আছে তোমার কি ভালো লাগছে?

লাগছে।

এখন আমি ফারুককে প্রশ্ন করব। ফারুক তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছে?

পাচ্ছি।

তুমি কোথায়?

আয়না জগতে।

তোমার কি ভালো লাগছে?

না।

মিসির আলি বললেন, জগৎটা কেমন?

অন্য রকম।

ভয় লাগছে?

না।

এখানে থেকে যেতে চাও?

চাই।

আয়না জগতে এমন কি আছে যা এখানে নেই।

ফারুক থেমে থেমে বলল, আয়না জগৎ অন্য রকম জগৎ- চিন্তা এবং কল্পনার জগৎ।

মিসির আলির সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। তিনি দ্বিতীয় সিগারেট ধরতে ধরতে বললেন, আয়না তোমাকে বলছি। ভালো আছে?

জ্বি স্যার।

আয়না জগতে থেকে যেতে ইচ্ছা করছে?

হুঁ।

আশেপাশে তুমি কি দেখছ?

কিছুই দেখছি না। স্যার। শুধু ওকে আবছা আবছা দেখছি।

কিছুই দেখছি না কেন?

এই জগৎটা কুয়াশার। ঘন কুয়াশায় সব ঢাকা। হঠাৎ হঠাৎ কুয়াশা বাতাসে সামান্য সরে যায়। তখন কিছু কিছু দেখা যায়।

কি দেখা যায়?

সেটা আমি বলব না।

দরজায় টোকা পড়ছে। তরিকুল ইসলামের গলা শোনা গেল। মিসির আলি সাহেব খাবার দেয়া হয়েছে। এমন গরুর মাংস খাবেন যে মৃত্যুর পরেও মনে থাকবে। গরম গরম খেতে হবে। চলে আসেন। কুইক। দুই মিনিট সময়।

মিসির আলি, আয়নার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি আয়নার ভেতর থেকে চলে এসো।

ওকে কি সঙ্গে করে নিয়ে আসব?

হ্যাঁ। ফারুক! তুমিও আস।

দু'জনের ঘোর এক সঙ্গে ভাঙল। তারা তাকালো মিসির আলির দিকে। মিসির আলি বললেন, আয়না! তোমার মুঠোয় যে কাগজটা আছে সেটা দাও। চল খেয়ে আসি। ডিনার টাইম।

রাতের খাবার শেষ হয়েছে। তরিকুল ইসলামের আনন্দের সীমা নেই। গরুর মাংস যতটা ভালো হবার কথা তারচেও ভালো হয়েছে। মিসির আলি খাবার ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে এই নিয়ে কখনো কিছু বলেন না। তিনিও বললেন, মাংসের টেস্টটা অদ্ভুত। তরিকুল ইসলাম, মিসির আলির প্লেটে মাংসের বাটি ঢেলে দিলেন। মিসির আলি তেমন আপত্তি করলেন না। আলোচনা খাবার নিয়ে চলতে লাগিল- কে কখন কি সুখাদ্য খেয়েছে সেই গল্প। জানা গেল তরিকুল ইসলামের সবচে পছন্দের খাবার শুকনা মরিচের ভর্তা। শুকনা মরিচের সঙ্গে একটা রসুন দিয়ে পাটায়। পিষে ভরতা তৈরি করতে হয়। খেতে হয় মাড় গলা ভাত দিয়ে। ফারুক বলল, তার পছন্দের কোনো খাবারই পছন্দ না। সে এমন এক জগতে থাকতে চায় যেখানে কাউকে কিছু খেতে হয় না।

তরিকুল ইসলাম বললেন, তোকে তিন দিন কিছু খেতে না দিলে হাম হাম করে খাবি। যা দিবে। তাই খাবি।

আয়না বলল, তিন চার দিনতো আমি না খেয়ে থাকি।

তরিকুল ইসলাম চুপ করে গেলেন। কারণ ঘটনা সত্যি। আয়না। যখন তার ঘরে দরজা বন্ধ করে বাস করতে থাকে তখন সে কিছু খায় না।

মিসির আলি বারান্দায় বসেছেন বৃষ্টি থেমে গেছে। বৃষ্টি হবার কারণেই হয়ত শীত কমে গেছে। মিসির আলির সামনে আয়না এবং ফারুক। মিসির আলি বললেন, তোমরা আগ্রহ নিয়ে বসেছি- আমি তোমাদের বিষয়ে কি বুঝলাম তা জানার জন্যে। আমি কিছুটা বিবৃতই বোধ করছি কারণ তেমন কিছু বুঝতে পারি নি। মানুষকে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। নিজের জগতের বাইরের জগত সম্পর্কে জানার ক্ষমতা দেয়া হয়নি। ম্যাথমেটিশিয়ানরা চার, পাাঁচ, ছয় ডাইমেনশনের অংক বের করেছেন। সবই Abstract ব্যাপার। তারা বলছেন, আমাদের ত্রি মাত্রিক জগৎ হচ্ছে চার মাত্রার জগতের ছায়া। আবার চার মাত্রা হচ্ছে পাঁচ মাত্রার জগতের ছায়া। দারুণ জটিল ব্যাপার ছায়ার জগৎ।

আয়না বলল, আপনি যা বুঝেছেন। তাই বলুন। আয়না জগৎ কি আছে?

মিসির আলি হতাশ গলায় বললেন, আছে। তার প্রমাণ তোমার হাতের মুঠোয় রাখা কাগজ। সেখানে আমি লিখেছিলাম নদী, পাখি, ফুল। তুমি আয়না জগৎ থেকে বের হয়ে আসার পর লেখাগুলি হয়ে গেল উল্টা–mirror image-এই লেখা আয়নার সামনে না ধরলে পড়া যাবে না!

মজার ব্যাপার হচ্ছে ফারুক একটা দীর্ঘ চ্যাপ্টার এই ভাবে লিখেছে। যা সে লিখতে পারে না। ধরে নিচ্ছি। এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে সে একবার আয়না জগতে ঢুকেছিল বলে লেখা mirror image হয়েছে। অবশ্যই ফারুক এমন একজন যার সঙ্গে আয়না জগতের যোগাযোগ আছে। ব্যাপারটা সে অতিযত্নে গোপন রেখেছে। আয়নার যে সব ক্ষমতা আছে

তার সবই আমার এই ছাত্রের আছে। আমার যখন প্লুরিসি হলো একটা ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছিলাম। কেউ তার ঠিকানা জানে না। ফারুক ঠিকই উপস্থিত হলো। আমি কিছুদিন পর পর বাসা বদল করি। নতুন ঠিকানা কাউকে জানাই না। ফারুক ঠিকই ঠিকানা জানে। সে চিঠি লিখেছে।

যে ছাত্রকে নামে চিনতে পারছি না তার একটা চিঠিতে আমি ঢাকা ছেড়ে ছাত্রের শ্বশুর বাড়িতে উপস্থিত হব আমি সেই লোক না। ফারুক আমাকে প্রভাবিত করেছে। সে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে রহস্য উদ্ধারের। আমার সাহায্য সেই কারণে নিয়েছে। সরি আমি সাহায্য করতে পারি নি।

তোমাদের জগৎ সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। জানতে পারব তাও মনে হচ্ছে না। তবে তোমাদের দু'জনকেই আমি একটা উপদেশ দিচ্ছি। প্রকৃতি একই ধরনের দু'জনকে কাছাকাছি এনেছে। তার নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে। তোমরা আলাদা হয়ে না। তার জন্যে তোমাদের যদি পুরোপুরি আয়না জগতে স্থায়ী হতে হয়- হবে। এর বেশি আমার কিছু বলার নেই। Good luck.

মিসির আলি মাজেদকে নিয়ে ঢাকায় চলে এসেছেন। তাকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। মিসির আলি প্রতি সন্ধ্যায়। তাকে পড়াতে বসেন। পাঠে তার প্রবল আগ্রহ।

ফারুক বা আয়নার সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ নেই। তবে তিনি তরিকুল ইসলাম সাহেবের কাছ থেকে অদ্ভুত একটি চিঠি পেয়েছেন—

প্রিয় ভাইসাহেব,

আসসালাম। মহা বিপদে পড়িয়া আপনাকে পত্র দিতেছি। আপনি যে দিবসে ঢাকা রওনা হয়েছেন সেই দিবসের রাতের কথা। খাবার খাওয়ার জন্যে আমার স্ত্রী মেয়ে এবং মেয়ে জামাইকে ডাকতে গেল। রান্না হয়েছে–সরপুটি ভাজা, কৈ মাছের (মিডিয়াম সাইজ) ঝোল এবং টেংরা মাছ (কোল ঝোল) কন্যার মা ফিরে এসে বললেন, ঘরে কেউ নাই। শুধু যে ঘরে কেউ নাই তা-না, বাহিরেও নাই। আমি অনুসন্ধানের বাকি রাখি নাই। জামাই গোপনে স্ত্রীকে নিয়া কর্মস্থলে চলে গেছে তাও সম্ভব না। রেল স্টেশন পাঁচ কিলোমিটার দূরে। বাহন ছাড়া যাওয়া অসম্ভব। বাড়িতে রিকশা বা টেম্পে আসে নাই। আমি থানায় জিডি এন্ট্রি করিয়াছি। জামাইয়ের কলেজের প্রিসিপ্যাল সাহেবের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করিয়াছি তিনিও কিছু জানেন না। আমার নিজের ধারণা জীনভূতের সঙ্গে এই ঘটনার সম্পর্ক আছে। জীন অনেক সময় পছন্দের ব্যক্তিকে তাহাদের দেশে নিয়া যায় এবং লালন পালন করে। আমি আমার মনের কথা কাউকে বলিতে পারিতেছি না। এখন মোবাইল টেলিফোনের জমানা। এই জমানায় কেউ জীন-ভূত বিশ্বাস করে না। ভাই সাহেব দয়া করিবেন যেন মহা বিপদ হইতে উদ্ধার পাই।

ইতি
তরিকুল ইসলাম

পুনশ্চ: মাশুল মাছের সন্ধানে আছি। পাওয়া মাত্র মোবাইল করিব। চলিয়া আসিবেন।

মিসির আলি বড় দেখে একটা আয়না কিনে নিজের শোবার ঘরে টানিয়ে রেখেছেন। তার ধারণা কোনো এক দিন আয়নায় ফারুক এবং তার স্ত্রীর দেখা পাওয়া যাবে। তাদের কোলে থাকবে অপূর্ব এক শিশু। শিশুটির দুষ্টমী ভর্তি চোখ দেখার তাঁর খুব শখ।